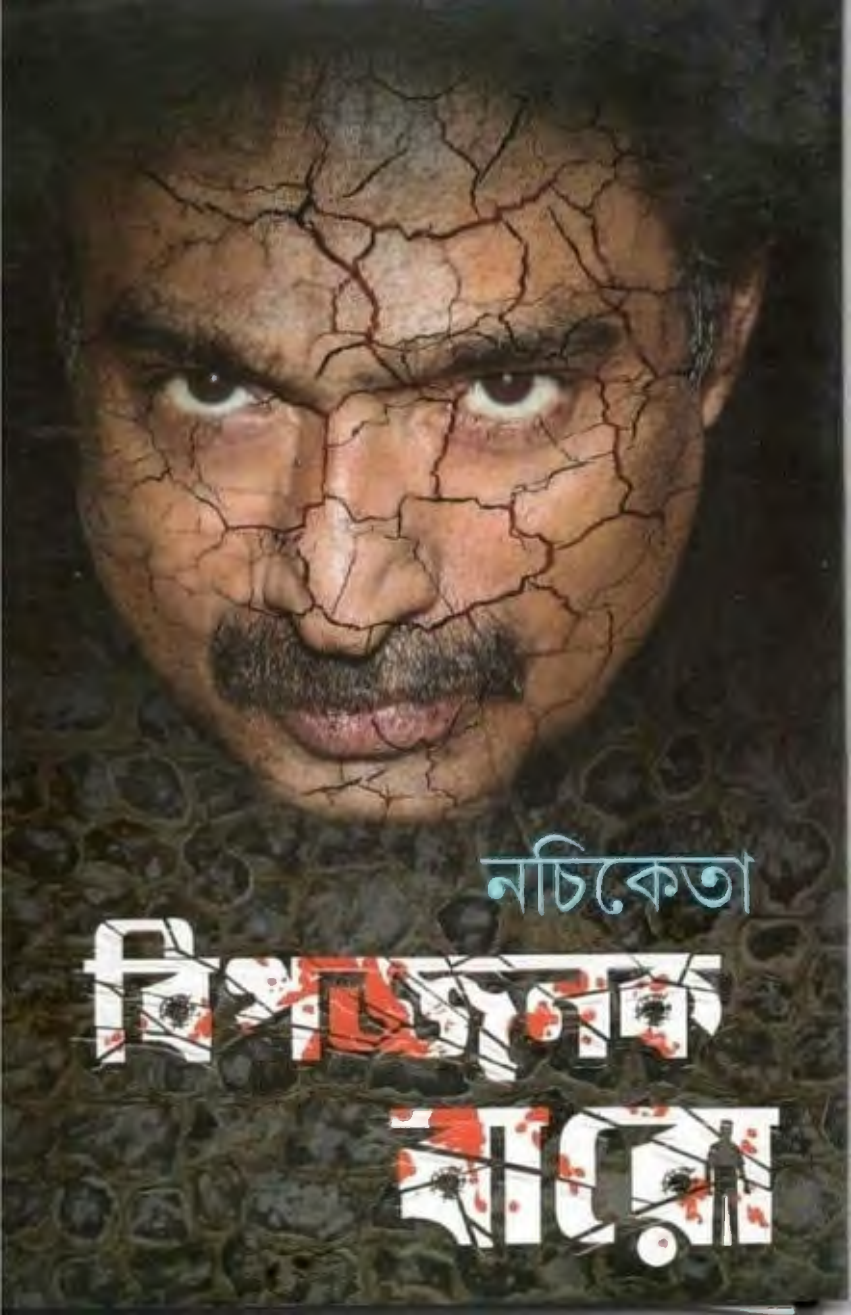
নচিকেতা
বিপজ্জনক খেলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধানসিড়িকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর আগে গোটা পনেরো বই হয়ে ছাপা হয়েছিল। সেই ভরসাতেই আবার কলম ধরলাম।

অবশ্যই গল্প লেখার জন্য!!!

আসলে আমি ভীষণ কুঁড়ে। পরীক্ষার সময়েও কোনোদিন অতিরিক্ত পাতা নিই নি। স্কুল কলেজের পরে যখন আবিষ্কার করলাম, গান লিখতে গেলে কম লিখতে হয়—শিফট করে গেলাম গানেই। কোনো মহান উদ্দশ্যে নয়, স্রেফ নিজের কুঁড়েমিটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

এবার গল্প লিখতে বসলাম উত্যক্ত হয়ে—দুজনের জ্বালায়! একজন প্রকাশক ত্রিদিবদা, আরেকজন আমার মেয়ে।

কেমন হয়েছে, আপনারাই বলবেন। গল্পগুলো একটু অদ্ভুত—ঠিক আমার মতো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরাণ মণ্ডলের বউ

বরুণ বেঁচে গেল

কালযবন

সেদিনটা এসেই গেল

মরতে দম তক

বনির জন্য

অপদেব

টোটেম

যখন সময় থমকে দাঁড়ায়

ইতি হত

ম্যাজিশিয়ান

আমরা পাথর বলছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—

AMARBOI.COM

পরাণ মণ্ডলের বউ

ধড়মড় করে ঘুম থেকে উঠে বসে পরাণ মণ্ডল। ভোরের আলো তখনো ফোটেনি। দুঃস্বপ্নগুলো এই সময়ই আসে। আগে হলে প্রতিমা বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে জল দিত। বলত, 'পেট গরম হয়েসে। কাল রাতে ডিম খাওয়া উচিত হয়নিকো।'

এখন পরাণ নিজেই খাট থেকে নামে, এক ঘটি জল খায়। সত্যি গলাটা শুকিয়ে গেছিল। তারপর দরজা খুলে বাইরে দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। আকাশ এখনো অন্ধকার বাইরে দড়িতে কিছু জামাকাপড় মেলা ছিল। সেগুলোই তুলতে থাকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাঁজ করতে থাকে।

একসময় আকাশ ফর্সা হতে লাগল। পরাণের আর কোনও কাজ নেই। সে দাওয়া বসে পড়ে, মুগ্দ চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। সবসময় তার মনে হয় সূর্যটা যায় কোথায়? এদিকে ওঠে, ওদিকে ডোবে মাঝখানে থাকে কোথায়?

প্রতিমাকে প্রশ্ন করায় সে বলেছিল, 'আমরা হলুম আদার ব্যাপারী, জাহাজ জেনে কী লাভ? যেখানেই থাক না কেন, সে তার বিষয়। আমাদের নাক গলানো অনুচিত।'

প্রতিমা তার স্ত্রী হলেও, পরাণ তার স্ত্রীকে খুব মান্যিগণ্যি করত। প্রতিমার ছিল সুন্দর স্বাস্থ্য, প্রবল সাহস, কাজ করার বিরাট উৎসাহ এবং ক্ষমতা। আর পরাণ তো একটু নড়েভোলা গোছের। এক কাজে এক বেলা। তাকে নিয়ে সংসার করা যে কত কঠিন তা সে এখন বোঝে। কিন্তু প্রতিমা কী সুন্দর সামাল দিত। একা হাতে হাট, বাজার, দোকান সামলানো, হাঁস-মুরগির যত্ন, বাগান করা, সর্বোপরি পরাণ মণ্ডলকে সামলানো। এখন সব একা-একা করতে গিয়ে পরাণের ল্যাজে-গোবরে অবস্থা।

পরাণ এবার বিড়বিড় করে নিজেই বলে, 'ওঠো বাপু, বিস্তর কাজ পড়ে। এভাবে নবাব-পুত্তুরের মতো কেতরে থাকলে চলবেনিকো, তোমার কাজ কোনও সুমুন্দির পো দাঁত কেলিয়ে করে দিবেনি। নিজেরই করে নিতে হবে।'

উঠে দাঁড়ায় পরাণ। তারপর দাওয়া, উঠোন সব ঝাঁট দিতে থাকে। হাঁস-মুরগিদের খাবার দেয়, তারপর পাশের দোকানটা খোলে। মুদিখানায় মালপত্র তেমন কিছু নেই, তবু দোকান খোলে, ধূপ জ্বালায়, শুরু হয়ে যায় পরাণ মণ্ডলের দৈনন্দিন জীবন।

জায়গাটার নাম নারায়ণগঞ্জ। নামেই গঞ্জ, আসলে এটা একটা গণ্ডগ্রাম। গঞ্জ প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে। সেখানে মঙ্গলবার হাট বসে। প্রতিমা সেখান থেকেই দোকানের জিনিস কিনে আনত। পরাণকে যেতে দিত না। বলত, 'তোমার তো কাছা দিতেই দিন ফুরায়। তুমি বরং ঘরদুয়ার আগলাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরাণ স্ত্রীর মুখের ওপর কোনওদিন কথা বলেনি। প্রতিমার সব কথাই সে মেনে নিয়েছে। মেনে তার কোনও ক্ষতি হয়নি। প্রতিমা তার সব দায়িত্বই নিয়ে রেখেছিল। প্রতিমা না-থাকায় পরাণের জীবনটা কেমন কাঠফাটা হয়ে গেছে, তা পরাণ এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে।

পরাণ এখন দোকানে বসে একটা তালপাতার পাখা নিয়ে হাওয়া খাচ্ছে। খদ্দের খুব একটা আসে না। কখনো কারও বাড়ির হঠাৎ চাল-ডাল ফুরিয়ে গেলেই তার দ্বারস্থ হয় কেউ কেউ। তাছাড়া পরাণ দোকানে মাছিই মারে।

সংসারে তার প্রয়োজনও খুবই কম। দিনেরবেলা সেদ্ধ-ভাতে বাগানের কোনও সবজি ফেলে দিয়ে তা দিয়েই মধ্যাহ্নভোজন, আর রাতে বার্লি। তার পোশাকেরও বায়না নেই। একটা ফতুয়া আর ধুতি, পায়ে রবারের চপ্পল। মাঝে মাঝে গাছতলায় একটা নাপিত আসে। দু-মাসে একবার চুল-দাড়ি কাটে। সাজগোজে তার কোনও উৎসাহ নেই। এই এঁদো গ্রামে কাকেই-বা নিজেকে দেখাবে!

এখানে জনমানুষই কম। এখানেই তার ঘর। দু-কামরার মাথায় টালির ছাউনি পাশে দোকান, সামনে ধু-ধু করছে মাঠ। বাড়ির পিছনে কচুবন। আর একটা পচা ডোবা। তার হাঁসগুলো সেই ডোবাতেই নেমে গুগলি খায়।

বেলা বাড়ে। পরাণ মণ্ডল তার দোকানের ঝাঁপ অর্ধেকটা বন্ধ করে, দোকান ছেড়ে ঘরে আসে। একঘটি জলে একচামচ ছাতু গোলে এবং ঢক ঢক করে গিলে নেয়।

এবারে তার পছন্দের কাজ—সে উঠোনে যায়। একপাশে তাল করে রাখা মাটি, সে বসে পড়ে সেই মাটি মাখতে, পাশেই জড়ো করে রাখা মাটির নানান বাসন, যা সবই তার হাতে তৈরি। এই কাজটাই নাকি সে ভালো পারে। অন্তত প্রতিমা তাই বলত। এই একটা কাজেই প্রতিমা তাকে পুরো স্বাধীনতা দিত, আর পরাণও সেই স্বাধীনতা খুব করে উপভোগ করত।

বেলা বেড়েই চলেছে। পরাণ ঘর্মাক্ত শরীরে মাটি মেখেই চলেছে। প্রতিমা বলত, মানুষও হল গে মাটির মতো—যেমন ছাপ দেবে, তেমনই রূপ নেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ও কাকা।'—পরাণ ঘুরে তাকায়। দেখে বিশ্বাসবাবুর ছেলে নারু এসে দাঁড়িয়েছে, 'দিদির শ্বশুরবাড়ি থিকে লোক এয়েচে, বাবা বললে বিসুকট নিয়ে আয়।'

পরাণ তার কাদামাখা হাত দেখিয়ে বলে, 'নিজে নিয়ে নে।'

নারু দোকানের ভিতর ঢুকে যায়। চেঁচিয়ে বলে, 'ছ'টা নিলুম গো।'

কিন্তু পরাণ বোঝে সুমুন্দির পো নির্ঘাত আটটা নিয়েছে।

নারু চলে যায়। এবার পরাণ চাকির দিকে এগোয় একতাল মাটি নিয়ে। এবারই আসল কাজ। এবারই মাটি তার রূপ নেবে। চাকি ঘুরে চলেছে। পরাণ দক্ষতার সঙ্গে মাটির গেলাস বানিয়ে চলেছে। হঠাৎ খসমস শব্দে পিছনে তাকিয়ে দেখে বেড়া টপকে ভুলো কুকুরটা এসে কাঁচুমাচু মুখে তার দিকে তাকিয়ে।

পরাণ হেসে বলে, 'যত্তসব হাড় হাভাতের দল। তা তুমি একা কেনে, আর জন কই?'

পরাণ উঠে দাঁড়ায়। বড় মাটির গামলায় হাত ধোয়। গামছা দিয়ে হাত মুছতে মুছতে দেখে, মাঠ পার হয়ে একজন দ্বিধাজড়ানো পায়ে তার উঠোনের দিকে এগিয়ে আসছে। পরাণ ভুলোকে বলে, 'ওই আসছে তোমার দোসর।'

পরাণ মনে মনে বলে, 'আজ বড় দেরি হয়ে গেল গো।'

তারপর মাটির তৈরি একটা উনোনে একটা হাঁড়ি চড়িয়ে তাতে আগুন দেয়। ভুলো আর বেড়ার সামনের লোকটার উদ্দেশ্যে বলে, 'আজ খানিক দেরি হবে বাপু। এই দিকটায় একটু নজর রাখো। আমি চান করে আসি।'

ভুলো কী বুঝল, কে জানে। বেড়া ধরে দাঁড়ানো ধুতি-পরা খালি-গায়ে লোকটা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। পরাণ একটা গামছা নিয়ে মাঠ পেরিয়ে এগিয়ে যায় তালপুকুরের দিকে।

যবে থেকে প্রতিমা গেছে, এ তার রোজকার রুটিন। চান করে সে যখন ফিরে আসে, তখন দেখে বেড়ার ধারে দাঁড়ানো লোকটা আর বেড়ার ধারে নেই। সে উনুন থেকে হাঁড়িটা নিয়ে মাড় গালছে। ভুলো পরম উৎসাহে ল্যাজ নাড়ছে। পরাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা শুকনো কাপড় নিয়ে পরতে থাকে। ভিজে কাপড়টা বেড়ার পাশে মেলে দেয়।

ততক্ষণে মাড় গালা হয়ে গেছে, একটা থালায় ভাতও বাড়া হয়ে গেছে। পরাণ বলে, 'এবার তোমরাও নিয়ে নাও হে।'

পরাণ জানে, সে না বললেও সেটা হবে। তবু সে বলে, একটু কর্তৃত্ব দেখায়।

পরাণ দাওয়ায় খেতে বসে। ভুলো আর লোকটা উঠোনের এককোণে বসে ভাত খায় নুন সহযোগে। খাওয়ার পর পরাণ দোকানে গিয়ে বসে। অন্য লোকটা উচ্ছিষ্ট ও উঠোন পরিষ্কার করে।

দোকানে বসে পরাণ তালপাতার পাখার বাতাস খায়। একসময় লোকটা এসে দ্বিধাজড়ানো গলায় বলে, 'আজ তা হলে আজ্ঞা হোক কত্তা।'

পরাণ বলে, 'তুমি তাহলে এসো রশিদ মিয়া। কাল দেখা হবে।'

রশিদ মাথা নেড়ে বিদায় নেয়। পরাণ ভাবে, তার এই দুই পুষ্যি অন্তত দিনে একবার খোঁজ নেয়, আসে তার কাছে। যদিও তা অবশ্য খাবারের লোভে, কিন্তু তা-ও তো আসে। প্রতিমা চলে যাবার পর তার তো কথা বলারও কোনও লোক নেই।

আস্তে আস্তে বিকেল হয়। অন্ধকার ডানা মেলে। পরাণ দোকান বন্ধ করে, ঘরে ঢুকে একটা হ্যারিকেন জ্বালায়। রোজকার মতো এক শূন্যতা তাকে ঘিরে ধরে, রোজই ধরে।

হ্যারিকেনের বিষণ্ণ আলোয় সে খাটের ওপর বসে থাকে। তার আর কিছু করার নেই। এবার ঘুমের অপেক্ষা। কিন্তু ঘুম মানেই তো যতসব আবোলতাবোল স্বপ্ন। পরাণের হতাশ লাগে। ইচ্ছে করে চিৎকার করতে। কিন্তু খাটের ওপর চুপ করে বসেই থাকে।

রাত বাড়ে পায়ে পায়ে। এক সময় পরাণ উঠে এক বাটি বার্লি খায়। তারপর হ্যারিকেন নিভিয়ে দরজা দিয়ে শুয়ে পড়ে পরের সকালের অপেক্ষায়। প্রতিমা চলে যাবার পর থেকে এটা তাঁর রোজকার রুটিন। প্রতিমা কবে চলে গেছে, সেসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরাণের খুব একটা মনে পড়ে না। কিন্তু প্রতিমা নেই, সেটা পদে পদে অনুভব করে।

তার স্মৃতিশক্তি একটু দুর্বল। সব কথা মনে পড়ে না। কথার মানে বুঝতেও একটু দেরি হয়। সেই কারণে সে একটু ধীরজ। তার কানে এসেছে, গাঁয়ের লোকে তাকে 'হাবা পরাণ' বলে ডাকে। কিন্তু সে গায়ে মাখে না।

প্রতিমা বলেছিল, একবার ছোটবেলায় নাকি তার কালাজ্বর হয়েছিল। সেই থেকে তার ঘিলুটা নড়ে গেছে। পরাণের সে সব কিছুই মনে নেই। সে মনে মনে ভাবে, দুদিন আগের কথাই তার মনে নেই, আর কিনা ছোটবেলার কালাজ্বর!

একবার সে প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করেই ফেলেছিল, 'আমাদের কতদিন হল বে হয়েসে?

প্রতিমা উনুনে আগুন দিচ্ছিল। ঘুরে তাকায়, চোখে বিরক্তি। পরাণ তোতলায়, 'মানে হল, আমরা একসঙ্গে কতদিন আছি?'

প্রতিমা মুচকি হেসে বলেছিল, 'জন্মজন্মান্তর।'

একদিন পরিষ্কার জামাকাপড় পরে সে প্রতিমাকে বলেছিল, 'চলো, তোমারে নে শ্বশুরবাড়ি যাই।'

প্রতিমা অবাক হয়ে বলেছিল, 'সেখেনে যাবে কোথায়? আমার বাবা-মা তো নাই। আর গেল বর্ষায় তো দাদাও মরে গেল কলেরায়। তোমার কি কিছুই মনে নাই?'

পরাণ লজ্জায় পড়ে গেছিল। কোনওরকমে মাটি মাখার নাম করে পালিয়ে বাঁচে।

হাটবার। পরাণ মণ্ডল ফিরছে হাট থেকে, সঙ্গে রশিদ। দুজনের হাতে-কাঁধে মালপত্র। পরাণ খুব ভালো সওদা বোঝে না। প্রতিমা বলত, 'তোমারে লোকে ঠকায়ে ফতুর করবে।' সত্যিই বোঝে সে, আজকেও তাকে সবাই ঠকিয়েছে। কিন্তু সে গায়ে মাখে না। এক মাসের জন্য নিশ্চিন্ত।

রশিদ ছেলেটা মন্দ নয়। মাস ছয়েক আগে বিশ্বাসবাবুদের বাঁজা জমিটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোপানোর কাজে এসেছিল। পরাণের বাড়ির পাশেই সে-জমি। সেখানেই একটা চালা বানিয়ে রশিদ থাকে। দিনের বেলা পরাণের বাড়িতেই খায়, রাতে কোথাও জুটিয়ে নেয়। খাবারের বিনিময়ে সে পরাণের ফাইফরমাশ খেটে দেয়।

রশিদ অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল না, পরাণ তার কোনও কথাই বুঝতে পারছে না। পাছে রশিদ বুঝে ফেলে, তাই পরাণ মাঝে মাঝে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ছিল। যেন সে সব বুঝছে। আসলে কেউ তাড়াতাড়ি কথা বললে সে খেই হারিয়ে ফেলে। এ সবই ওই কালাজ্বরের মাহাত্ম্য!

দরজা দিয়ে থানার দারোগাকে দেখা যাচ্ছে। দারোগা টেলিফোনে কথা বলছে হেসে হেসে। দুজন কনস্টেবল একজন লোকের সঙ্গে কী গুজগুজ করছে। বাইরে একটা জরাজীর্ণ জিপ দাঁড়িয়ে। থানায় খুব একটা উত্তেজনা নেই।

বারান্দার এক কোণে পরাণ তিনমাথা বুড়োর মতো উবু হয়ে বসে। যদুনাথ একজন কনস্টেবলকে তদ্বির করছে। একসময় কনস্টেবলটি দারোগাকে গিয়ে কিছু বলে। দারোগা এবার ফোন রেখে বলে, 'ডাকো'।

যদুনাথ পরাণকে নিয়ে ঘরে ঢোকে। দারোগা হাসিমুখে বলে, 'কার বউ হারিয়েছে?'

যদুনাথ পরাণকে দেখিয়ে বলে, 'এজ্ঞে এর।'

দারোগা পরাণকে আপাদমস্তক দেখে কনস্টেবলকে বলে, 'এর কি বউ থাকা উচিত?' বলেই হাসতে শুরু করে। তারপর গম্ভীর হয়ে বলে, 'বয়স কত? মানে তোমার বউয়ের?'

পরাণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। যদুনাথই বলে, 'এজ্ঞে কাকার থেকে অনেক ছোট।'

দারোগা কনস্টেবলকে ভুরু নাচিয়ে বলে, 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা।'

তারপর পরাণকে ধমক দিয়ে বলে, 'কী রে! মারধর করতি নাকি?'

পরাণ পিটপিট করে তাকিয়ে থাকে। যদুনাথ বলে, 'না সার। পরাণকাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বিরোধী মানুষ। নিজে হেঁচে নিজেই ভয় পায়। একেবারে কী বলে

মাটির মানুষ।'

দারোগা গম্ভীর হয়ে বলে, 'সে তো ওর গায়ের মাটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কদ্দিন যে চান করেনি কে জানে! তা কেমন দেখতে তোমার বউকে?'

যদুনাথ বলে, 'দুগ্গা পিতিমের মতো।'

দারোগা বলে, 'তা দুগ্গা পিতিমা এই মহিষাসুরের মোষটার সঙ্গে কী করে ছিল?'

যদু বলে, 'সে তো সার বিধাতার লিখন।'

দারোগা বলে, 'তা বিধাতার লিখন হয়তো তার পছন্দ হয়নি, তাই চলে গেছে।'

'তা কারুর সঙ্গে, ভাব-ভালোবাসা ছিল? মানে কারুর সঙ্গে ওর বউয়ের বেশি মেলামেশা ছিল?'

যদুনাথ বলে, 'এজ্ঞে জানি না। তবে সার জেলেপাড়ার হারানরেও পাওয়া যাচ্ছে না। সে নাকি কলকাতায় গেছে যাত্রায় নাম লেখাতে।'

দারোগা যেন সমাধান পেয়ে গেছে, এইভাবে বলে, 'দ্যাখ, নির্ঘাত ওই হারানের সঙ্গেই চলে গেছে।'

এবার পরাণ মৃদু গলায় বলে, 'এজ্ঞে তাহলে কি বউটারে আর পাবুনি?'

দারোগা এবার দার্শনিকের মতো উদাস গলায় বলে, 'কা তব কান্তা! বউকে লিয়ে কিউ কানতা? ভাগ্যবানের বউ মরে, নয় হারায়। যদি আমার এই কেস হত, তবে আমি তো পিকনিক করতাম। তুমিও পিকনিক করো, যাও।' বলে একটা ফাইল তুলে নেয়।

যদুনাথ বলে, 'তাহলে আমরা কি সার চলে যাব?'

দারোগা বলে, 'ছোটবাবুর কাছে যাও। সে ডাইরি লিখে নেবে। আর একটা ছবি দিয়ে যেয়ো, ওর বউয়ের।'

পরাণ বেবাক হয়ে ঘর থেকে বেরোয়। প্রতিমার কোনও ছবি তো তার কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। একবার মেলায় সে ছবি তোলার বায়না করেছিল। দুজনের ছবি। প্রতিমা নাকচ করে দিয়েছিল। পরাণরা ডায়েরি করে থানা থেকে চলে এসেছিল।এসব বহুদিন আগের কথা। ছবি না থাকায় পুলিশ তেমন সুবিধে করতে পারেনি বোধহয়। পরাণ ভাবে মনে মনে।

যদি বুদ্ধি করে একটা ছবি তোলা যেত, তা হলে পুলিশ হয়তো একটা হদিশ করতে পারত। কিন্তু এ বছরের প্রথমে পরাণ বড় অস্বস্তিতে পড়ে যায়। সে ছবি পায়। কিন্তু এখন ভাবে, না পেলেই ভালো হত।

একবার হাট থেকে প্রতিমা একটা পুতুল নিয়ে আসে। তার নাম নাকি 'লাফিং বুদ্ধ'। প্রতিমা বলত 'হেসো বুড়ো।' এ ঘরে থাকলে নাকি ঘরে সুখ আসে।

তা সে বুড়ো ছিল পুবের জানলার সামনের তাকে। প্রতিমা চলে যাবার পরেও ছিল। বিপদ ঘটাল একটা কাক। একদিন ঢুকে পড়ে ডানার ঝাপটানিতে বুড়োকে ফেলল মাটিতে।

পরাণ তখন দোকানে। আসতে আসতে, যা হবার হয়ে গেছে। মাটিতে পড়ে বুড়ো ছত্রখান। পরাণ ঝাঁটা তুলে আবার রেখে দেয়। দেবতা মানুষ! ঝাঁটা লাগলে পাপ হবে। হাত দিয়েই টুকরোগুলো তুলতে থাকে। তখনই সে পায় একটা নীল রং-এর টুকরো। হয়তো পুতুলটার পেটের মধ্যে ছিল।

বস্তুটা সম্ভবত প্লাস্টিকের। কিন্তু এমন বস্তু পরাণ কোনওদিন দেখেনি। সুতরাং বুঝে উঠতে পারছিল না, এটা নিয়ে কী করবে!

দু-তিনদিন এই ভেবেই কেটে গেল। একদিন গ্রামের তারক সাইকেল করে সামনের মেঠো-রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। পরাণ তখন দোকানে বসে। তারককে দেখে তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। সে তারককে ডাক দেয়। তারক সাইকেল ঘুরিয়ে দোকানের সামনে আসে, 'বলো কাকা?'

পরাণ তাকে নীল রং-এর টুকরোটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'বাবা তারক, ইটা কী বাবা?

তারক বস্তুটা হাতে নিয়ে অবাক গলায় বলে, 'ইটা কুত্থিকে পেলে গো কাকা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরাণ প্রশ্ন করে, 'ইটা কী?'

তারক বলে, 'ইটা তো পেন ড্রাইভ বটে। তুমার কাছে কী করে এইল?'

পরাণ চট করে বলে, 'হাট থিকে ফেরার সময় পথে পেলাম।'

তারক বলে, 'তাই বলো!'

পরাণ বলে, 'ইতে কী আছে?'

তারক বলে, 'সে তো খুলে দেখতি হবে। কত কী থাকে—ছবি, গান, বায়োস্কোপ।'

পরাণ বলে, 'এইটুক জিনিস খুলব কী করে? ভেইঙি দেখব?'

তারক ব্যস্ত হয়ে বলে, 'আরে, না, না কাকা। খুলতি হলি কম্পুটার লাগবে।'

পরাণ ড্যাবড্যাব করে তারকের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারক এক সময় চলে যায়। যাবার আগে ওই নীল টুকরোটার জট খোলার হদিশ দিয়ে যায়।

সদর সুকল প্রায় পনেরো কিলোমিটার দূরে। পরাণ যখন সেখানে পৌঁছল, তখন সুকল ছুটি হয়ে গেছে। ছাত্ররা চলে গেছে। এবার মাস্টারদের পালা। একে ওকে জিজ্ঞাসা করে পরাণ বিশ্বজিৎ স্যারের সন্ধান পেল।

বিশ্বজিৎ তখন সাইকেলে উঠতে যাচ্ছে। এমন সময় একজন গ্রাম্য মানুষ তার সামনে এসে নমস্কার জানাল। বিশ্বজিৎ সব শুনে বলে, 'আজ তো ছুটি হয়ে গেছে। কাল আসুন।'

লোকটা বলে, সে অনেকদূর থেকে এসেছে। আবার কাল আসা বড় হাঙ্গামা।

বিশ্বজিতের মনটা ভালো ছিল। সে বলে, 'আসুন।'

বিশ্বজিৎ কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে বসে, নীচে উবু হয়ে পরাণ। পেনড্রাইভটা খোলা হয়েছে। অদ্ভুত কিছু লেখা! বিশ্বজিতের বোধগম্য হচ্ছে না। সে পরাণকে বলে, 'কাকা, এসব তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তার চেয়ে বরং কিছু ছবি আছে, সেগুলো দেখি।'

স্ক্রিনে কিছু ছবি এল। গোটা দুয়েক ছবির পরে যে ছবিটা এল, তাতে পরাণের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। প্যান্ট-জামা-পরা প্রতিমার একটা ছবি। তারপর আরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক প্রতিমার ছবি। কখনো ঘোড়ায় চড়া অবস্থায়, কখনো খুব সেজে গুজে।

বিশ্বজিৎ বলে, 'এ মেয়েটি কে গো কত্তা?'

পরাণ বিড়বিড় করে বলে, 'আমি কেমনে বলব বাবু?'

কেন যে পরাণ সত্যিটা বলে উঠতে পারল না, তা সে নিজেই বুঝতে পারল না। ভাবল এ-মানুষটাকে যদি সে বলে যে এটি 'আমার বউ', তা হলে হয়তো এ-বাবুই তাকে লাথি মেরে বের করে দেবে। বলবে, 'হ্যাঁ, ওই যে সিনেমার পোস্টারে যে মেয়েটাকে দেখছ সে-ও তোমার বউ!'

পরাণ চুপ করে থাকে। একসময় বিশ্বজিৎ একটা ছবি বের করে। বলে, 'এই ছবিটায় নাম আছে, ঠিকানাও আছে। ফাদার ড্যানিশ ফার্নান্ডেজ। ঠিকানা—নৈনিতাল, সেন্ট টমাস চার্চ।'

পরাণ বলে, 'সেটা কতদূর?'

বিশ্বজিৎ বলে, 'সে তো বহুদূর কাকা। এখান থেকে কলকাতা। তার পরে দিল্লি, তারপর নৈনিতাল।'

পরাণ বলে, 'বাবু, আমারে ওই মেয়েটার একটা ছবি আর ঠিকানাটা লিখি দিতি পারবেন?'

বিশ্বজিৎ বলে, 'পারব।'

ফাদার ফার্নান্ডেজ এখন বাধ্যতামূলক অবসরে আছেন। চার্চেরই পেছন দিকে তাঁর কটেজ। চার্চ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছুটিতে থাকতে বলেছে। কারণ তাঁর পেটে জটিল আলসার। চল্লিশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। এই চার্চ এবং সুকলটা নিজের হাতে তৈরি করেছেন।

অবসরে থাকতে তাঁর খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না। ভীষণ আমুদে লোক। কথা বলতে ভালোবাসেন। কিন্তু এখন কথা বলার লোক খুব একটা পান না। এছাড়াও আর একটা সমস্যা। তিনি সিগারেট খেতে ভালোবাসতেন। ডাক্তারের নির্দেশে এরা তাঁকে সিগারেট খেতে দিচ্ছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিন সকালেও তিনি বিমর্ষতা নিয়েই ইজিচেয়ারে বসে একটা বই-এ চোখ বোলাচ্ছিলেন। এমন সময় দারোয়ান এসে বলে, পরাণ মণ্ডল নামে একজন মানুষ তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। এসেছে সুদূর বেঙ্গল থেকে। ফাদার একটু অবাক হন। আবার খুশিও হন। যাক্, অনেকদিন পরে আবার বাংলায় কথা বলতে পারবেন। আসলে তিনি বাঙালি—দীনেশ বিশ্বাস। পরে ধর্মান্তরিত হলে 'দীনেশ'টা ড্যানিশ হয়ে গেছে।

একজন কালোকুলো মানুষ এসে দাঁড়াল। হাতে একটা টিনের বাক্স, বগলে ছাতা। নোংরা একটা ফতুয়া। তার চেয়েও নোংরা একটা ধুতি। পায়ে রবারের চটি। গায়ে প্রবল দুর্গন্ধ। লোকটা এসে তাঁকে প্রণাম জানাল। ফাদার নাটকীয়ভাবে প্রশ্ন করেন, 'নিবাস কোথায়?'

পরাণ কাঁচুমাচু গলায় বলে, 'এজ্ঞে, আমি তো এখানে নতুন। তা নিবাসবাবু কুথায় আছেন তা আমি কী করি বলি বাবু।'

ফাদার হতাশ হয়ে ভাবেন, এ তো গণ্ডস্য গণ্ডমূর্খ। তারপর বলেন, 'বেশ। বুঝেছি। তা আমার সঙ্গে কী দরকার তোমার?'

পরান বলে, 'আমার একটা উপকার করে দেবেন বাবু?'

ফাদার ভুরু নাচিয়ে বলেন, 'এমনি কেন করব? আগে আমায় একটা সিগারেট খাওয়াও।'

পরাণ লজ্জিতভাবে বলে, 'এজ্ঞে, সিগারেট তো নাই বাবু। বিড়ি আছে। চলবে বাবু?'

ফাদার বলেন, 'বেশ, তাই দাও।'

ফাদার অনভ্যস্ত হাতে বিড়ি ধরান। তারপর বলেন, 'বলো, কী করতে হবে?'

পরাণ একটা প্রিন্ট করা ছবি ফাদারের হাতে দেয়। বলে, 'এর কোনও সন্ধান দিতি পারেন?'

ফাদার ছবি ভালো করে দেখেন। তারপর বলেন, 'হ্যাঁ চিনি, আমার খুব প্রিয় ছাত্রী। আমার মেয়ের মতোই বলতে পার। এ তো আমার এখানেই বড় হয়েছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর উচ্চশিক্ষা নিতে দিল্লি যায়। তারপর সরকারি চাকরি নিয়েছিল। খেলাধুলায় খুব ভালো ছিল।'

তারপরেই ভুরু কুঁচকে বলেন, 'একে তুমি চিনলে কী করে? এ মারা গেছে, তা-ও বছর পাঁচেক হল।'

পরাণ চুপ করে শোনে। বলে, 'আর কী জানেন বাবু?

ফাদার বলেন, 'জানি তো অনেক কিছুই। এর নাম শ্রদ্ধা কাপুর। বাবা-মা ওর ছোটবেলায় দিল্লিতে একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছিল। তারপর থেকে এখানেই ছিল, এই সুকলে পড়েছে। দশ বছর। তারপর দিল্লিতে। কলেজ, ইউনিভার্সিটি। তা ধরো আরও ছ-সাত বছর। চাকরিও দশবছর।'

পরাণ আস্তে আস্তে বলে, 'এজ্ঞে বাবু, কিছু ভুল হচ্ছে না তো? এরে আমি বহুদিন ধরে চিনি। এরে আমি ছোটবেলায় নিয়ে এয়েছিলেম। এর নাম প্রতিমা।'

ফাদার বলেন, 'দেখো, যার ছবি দেখাচ্ছ তার নাম শ্রদ্ধা কাপুর। সরকারি সুরক্ষা বিভাগে চাকরি করত। পাঁচ বছর আগে একটা অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে। এইটুকু আমি জানি। তা তুমি কী জানো বলো।'

পরাণ ইতস্তত করে বলে, 'এজ্ঞে, এর সঙ্গে গেল বর্ষার আগের বর্ষা অবধি একসঙ্গে ছিলেম। তারপর সে হারানের সঙ্গে চলে গেছে।'

ফাদার বলেন, 'কে হারান?'

পরাণ বলে, 'এজ্ঞে, জেলেপাড়ায় যাত্রা করত।'

ফাদার বিরক্ত হন, 'স্টুপিড! এ হারানের সঙ্গে যাওয়ার নয়, বুঝেছ! এ সুরক্ষা বিভাগের একজন দক্ষ অফিসার। সুরক্ষা বিভাগ বোঝ? র-এর নাম শুনেছ ছাগল?'

পরাণ হাবার মতো বসে আছে।

ফাদার উত্তেজিত গলায় বলেন, 'এজেন্ট বোঝো? জেমস বন্ডের নাম শুনেছ?'

পরাণ বলে, 'জেমস লজেন দেখেছি। আমার দোকানে আছে। তেমন বিক্রি হয় না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাদার ফেটে পড়েন, 'কোত্থেকে যে এসব গাধা চলে আসে আমার কাছে? পাঁচ বছর আগেও আমার সঙ্গে এই মেয়ের যোগাযোগ ছিল। অ্যান্টিটেররিস্ট সেলের দায়িত্বে ছিল। এক কুখ্যাত ইন্টারন্যাশনাল টেররিস্ট আফতাব আলমকে ধরার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছিল—কখনো সিরিয়া, কখনো পাকিস্তান, কখনো কাশ্মীর। প্রায় সফলও হয়ে গেছিল। হঠাৎ একটা বাস অ্যাকসিডেন্টে সে মারা গেল! বুঝেছ? আর তুমি বলছ তুমি, মানে তোমার মতো একটা এঁদো গ্রামের গণ্ডমূর্খ তাকে চেনে?'

পরাণ বলে, 'এজ্ঞে, এ আমার বউ।'

ফাদার আর পারেন না। চেঁচিয়ে ওঠেন, 'বেরোও! নিকলো ইঁহা সে। গেট আউট!'

পরাণ দোকান বন্ধ করে ঘরে আসে। এ সময়টা বড় মশা বাড়ে। পরাণ ঘরে ধুনো দেয়, ঘরটা ধোয়। হ্যারিকেনের আলোয় কেমন ঘোলাটে হয়ে যায় ঘর। ঠিক তার স্মৃতির মতো! সবসময় জট পাকিয়ে থাকে, একটার ঘাড়ে একটা। পরাণ ভাবে, ওই বুড়ো ফাদারটার ভীমরতি হয়েছে। তারও স্মৃতি নির্ঘাত ঘোলাটে। নইলে এর ঘাড়ে ওরে কেন বসাবে!

পরাণ ছবিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। অন্যের ছবি বয়ে বেড়িয়ে কী লাভ? এ ছবি তার বউ-এর নয়। যে বউয়ের সঙ্গে সে জন্মজন্মান্তর সংসার করেছে, সে কিনা একই সময় হিল্লি, দিল্লি করেছে ধিঙ্গি মেয়ের মতো! য্-যা, এ হতে পারে না। পরাণ সে সব নিয়ে আর ভাবতে চায় না। অবশ্য ভাবতেও পারে না। তার মাথা গুলিয়ে যায়। এসব ওই কালাজ্বরেরই মাহাত্ম্য। সময়, কাল, পাত্র কিছুই ঠিক থাকে না।

স্বপ্ন দেখে পরাণের ঘুম ভেঙে যায়। আকাশ ফর্সা হচ্ছে। কেন যে সে এমনসব ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে, পরাণ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। প্রতিমা বলত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ছোটবেলায় তোমার দাদু তোমারে নানান গল্প শোনাত। সেগুলোই স্বপ্নের আকার নেয়।'

পরাণের দাদুকেই মনে পড়ে না, গল্প তো দূরের। ভাবে, গল্পগুলোর কী তেজ, আজও তাড়া করে। আজ সে স্বপ্নে দেখেছে, সে একটা পাহাড়ের খাদে একটা গাছ ধরে ঝুলছে। তার সারা মাথা-গায়ে রক্ত। হঠাৎ কে যেন একটা হাত বাড়িয়ে দিল। হাতটা ধরতেই দেখল, হাতটা প্রতিমার।

ব্যস্! তার ঘুম ভেঙে গেল। খাটের ওপর পরাণ চুপ করে বসে থাকে। প্রতিমার মুখটা মনে পড়ে। একটু রাগ হয়। তারপর ভাবে, প্রতিমা যদি সুখী হয়, তাহলে তো ভালোই। প্রতিমা তাকে কত সুখে রেখেছিল তা তো সে জানে।

সেদিন রাত থেকে পরাণের ধুম জ্বর এল। অচৈতন্য হয়ে একা পড়ে থাকল। একঘটি জলও খেতে পারল না।

ভাগ্যিস তার খোঁজে রশিদ দরজা খুলে ভেতরে এসেছিল। তারপর দু-দিন কেটে গেছে। পরাণ এখন একটু সুস্থ। এ দু-দিন রশিদ ছিল তার ঘরে। তাকে সেবাশুশ্রূষা করেছে। জ্ঞান আসার পর তার প্রথমেই মনে হয়েছে, ব্যাটা ঘরের মালপত্র চুরি করেনি তো?

তারপর দেখেছে, না। কিছুই খোয়া যায়নি। তারপর ভেবেছে, আছেই বা কী, যা নেবে! ঘরে দুটো বড় তোরঙ্গ ছিল। একটা আছে এখনও। আর একটা প্রতিমা বোধ হয় নিয়ে গেছে যাবার সময়। প্রতিমা যাবার আগে কী কী নিয়ে গেছে পরাণ বুঝতে পারে না।

কারণ প্রতিমা তার অজান্তেই চলে গেছে। পরাণ তাকে আটকাতেও পারেনি। ঘরসংসার তো প্রতিমাই সামলাত। তাই কী নিয়ে গেছে আর কী রেখে গেছে, পরাণের কাছে সে হিসেবও নেই। প্রতিমার কিছু জামাকাপড় আছে। পরাণ মাঝে মাঝে তার গন্ধ শোঁকে।

পরাণ এখন খাটে বসে। সময় দুপুর। একটু আগে তার চোখ খুলেছে। এমন সময় রশিদ ঢোকে একগাল হাসি নিয়ে। বলে, 'যা খেল দেখালে কত্তা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেবেছিলুম এবারে বুঝি অক্কাই পেয়ে গেলে। আমার সেবার জোর আছে, কী বলো?'

পরাণ কিছু বলে না। চুপ করে বসে থাকে। রশিদ তাকে একবাটি বার্লি দেয়। সে বাধ্য ছেলের মতো খেয়েও নেয়। তারপর শুয়ে পড়ে। ভয় পায়, আবার যদি স্বপ্ন দেখে। উঃ, স্বপ্নগুলো এত বীভৎস, এত অলক্ষুণে! স্বপ্নে সবাই তাকে মারতে আসে। আর সে দৌড়োয়, আর চিৎকার করে। আগে হলে, প্রতিমা তাকে বুকে চেপে সাহস দিত। এখন সে বড্ড একা বোধ করে। ঘুমিয়েও পড়ে ভয়ে-ভয়ে।

হঠাৎ সেদিন মাঝরাতে পরাণের ঘুম ভেঙে যায়। বোঝে, তার বালিশটা ঘামে ভিজে গেছে।

হ্যাঁ, সে আবার দুঃস্বপ্ন দেখছিল! কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে সে চিৎকার করে কী বলল? এর মানেটা কী?

ছেঁড়াছেঁড়া ভাবে মনে করার চেষ্টা করে সে। ইনশাহআল্লা, জিহাদ, ফকর এসব শব্দ! মানে কী? ভাবে, খাটের নীচে আবার মাদুর পেতে রশিদ শুয়ে আছে। ব্যাটা শুনতে পায়নি তো? পরাণ মটকা মেরে শুয়েই থাকে।

খাটের নীচ থেকে রশিদের গলা শোনা গেল, 'কনগ্র্যাচুলেশন কমান্ডার! আপনার সব মনে পড়ে গেছে!'

পরাণ মণ্ডল খাটের ওপর পাথরের মতো শুয়ে থাকে! তার নড়াচড়ার শক্তি চলে গেছে! মাথার মধ্যে অজস্র বিদ্যুৎ ফালাফালা করে দিচ্ছে।

রশিদের গলা শোনা গেল, 'কমান্ডার, আমি তো ভেবেছিলাম, আপনার স্মৃতি আর কোনওদিনই ফিরবে না। ছ-মাস ধরে ছায়ার মতো আপনাকে ফলো করছি। আল্লা মেহেরবান আজ সেই দিনটা এল। ভাবতে পারেন, পাঁচ বছর ধরে সবাই ভেবে নিয়েছে আপনি মারা গেছেন, জম্মুর বাস দুর্ঘটনায়। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, আপনি মরতে পারেন না। বহু লোক মারা গেছিল। বহু বডি শনাক্ত করা যায়নি। শ্রদ্ধা কাপুরের বডিও শনাক্ত করা যায়নি। তখন মনে হয়েছিল, এর মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও রহস্য আছে। তারপর থেকে খুঁজেই যাচ্ছি আপনাকে।'

'আমার খোঁজ পেলে কী করে?' নিজের গলার পরিবর্তনে পরাণ নিজেই চমকে উঠেছে।

রশিদ বলল, 'নৈনিতাল থেকে। যখন দেখলাম শ্রদ্ধা কাপুরও উধাও। তখন থেকে নৈনিতালের চার্চটার ওপর নজর রাখছিলাম। যদি শ্রদ্ধা কাপুর কোনওভাবে সেখানে আসে। কিন্তু আশ্চর্য! শ্রদ্ধা কাপুর নয়, একবছর আগে আপনি সেখানে হাজির হলেন। দূর থেকে দেখেই চিনেছিলাম। কিন্তু ভয় হল। মনে হল, যদি ভুল হয়? ভয় হবারও কারণ ছিল। কারণ যাকে দেখলাম সে তো একেবারে অন্য মানুষ! গ্রাম্য, অশিক্ষিত বেজান পুতলা!

সেদিন থেকেই আপনাকে ফলো করছি। আপনার কাছাকাছি যাতে থাকতে পারি, তাই এখানে এসে ছ-মাস মাটি কোপাচ্ছি। ভাবুন, যে হাতে আপনিই মেশিনগান তুলে দিয়েছিলেন, সে হাতে কোদাল!

এখানে এসে শুনলাম, গত পাঁচ বছর ধরে আপনি এখানে আছেন। এক মহিলার সঙ্গে আপনি এখানে এসেছিলেন। সে নাকি আপনার স্ত্রী। নাম প্রতিমা। বর্ণনা শুনেই বুঝেছিলাম, সে আর কেউ নয়, শ্রদ্ধা কাপুর। আপনার পয়লা নম্বরের দুশমন!

কিন্তু দু-বছর আগে সে আপনাকে ছেড়ে কোথাও চলে গেছে। ভয় হল। কিন্তু দেখলাম, তারপরেও আপনি আছেন। কোনও পুলিশ এল না আপনাকে ধরতে। তার মানে বুঝলাম, শ্রদ্ধা কাপুর আপনাকে ধরিয়ে দিতে চায় না। খবর নিলাম। নাঃ, সে চাকরিতে জয়েন করেনি। যেভাবে সরকারি খাতায় হারিয়ে গেছিল, তেমনভাবেই থাকতে চাইছে। কিন্তু কেন? সেটা আজও বুঝতে পারিনি। আর এই ছ'মাসে দেখলাম, আপনারও কিছুই মনে নেই। আপনার স্মৃতিশক্তি হারিয়ে গেছে।'

পরাণ বলে, 'সে তো ছোটবেলায় কালাজ্বরে...'

রশিদ হেসে বলে, 'আমি আপনাকে ছোটবেলা থেকে চিনি। আপনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনওদিন কালাজ্বর হয়নি। আপনার স্মৃতি চলে যায় জম্মুর বাস অ্যাকসিডেন্টে। আমরা একটা মিটিং করতে যাচ্ছিলাম। বাস ভর্তি টুরিস্ট। আমি আপনাকে কভার করছিলাম অন্য সিটে বসে। ওই বাসে শ্রদ্ধা কাপুরও ছিল। সে আমাদের ফলো করছিল।

বাসটার হঠাৎ ব্রেক ফেল হয়। বাসটা খাদে পড়ে যায়। আমার দুটো পা ভেঙে যায়। বহু লোকের মৃত্যু হয়। আপনাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সবাই জেনেছিল, আপনি মারা গেছেন। পরে দেখলাম শ্রদ্ধা কাপুরও নিপাত্তা। এখানে এসে বুঝলাম শ্রদ্ধা কাপুরই আপনাকে রেসকিউ করে লুকিয়ে এখানে নিয়ে আসে—বর-বউ, বর-বউ খেলা খেলবে বলে। আর আপনিও তখন স্মৃতিহীন একতাল মাটির মতো। যা বোঝাবে তাই বুঝবেন। তা-ই বুঝে এসেছেন। আজ যখন ঘুমের মধ্যে 'ইনশাহ্ আল্লা', 'জিহাদ জিন্দাবাদ' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন, তখন বুঝলাম আপনার পুরোনো স্মৃতি ফিরে এসেছে।'

রশিদ এবার উঠে একটা কুপি ধরায়। আলোয় রশিদের মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। রশিদের চোখ চকচক করছে। বলে, 'কমান্ডার আফতাব আলম! পাঁচ-পাঁচটা বছর এই এঁদো গ্রামে কাটিয়ে দিলেন। এবার চলুন! জিহাদ আপনার অপেক্ষায়।'

পরাণ ততক্ষণে খাটের ওপর উঠে বসেছে। রশিদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ফিসফিস করে বলে উঠল, 'মেজর রশিদ খান!'

রশিদের চোখে-মুখে স্বস্তির ছায়া। পরাণ লক্ষ্য করেছে, রশিদের একটা হাত তার মাথায় রাখা ঝোলাটার মধ্যে ঢোকানো ছিল। এই ঝোলাটাই বালিশ করে সে তিনদিন মেঝেয় শুয়ে ছিল।

রশিদ হাতটা বার করল। সে-হাতে একটা রিভলভার, সাইলেন্সার লাগানো।

রশিদ কান-এঁটো করা হাসি হেসে বলে, 'সবসময় ভয়ে-ভয়ে থাকতাম, বুঝতে পারছিলাম না আপনি কীভাবে রি-অ্যাক্ট করবেন! তাই—'

পরাণ মৃদু হাসে। রিভলভারটা রশিদের হাত থেকে নেয়। তারপর ঘুরিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরিয়ে দেখতে থাকে। রশিদের চোখ ঝলসে ওঠে। বলে উঠল, 'এইবার মানিয়েছে! তা না, খালি মাটি মাখছেন, দোকান খুলছেন? এ কি আপনার জীবন কমান্ডার? তা-ও কার সঙ্গে ছিলেন? শ্রদ্ধা কাপুর, "র"-এর এক জাঁহাবাজ এজেন্ট! যে আপনাকে ধরবে বলে উঠে-পড়ে লেগেছিল! কিন্তু একটা বিষয় বুঝতে পারছি না কমান্ডার! আপনাকে হাতে পেয়েও সে কেন ধরিয়ে দিল না? কাশ্মীরের পাহাড় থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে নিয়ে এখানে চলে এল। এতদিন আপনার সঙ্গে কাটাল! কোন জসবাত, কোন আবেগে এটা করল। কিছুতেই বুঝতে পারছি না! দু-বছর আগে আপনাকে ছেড়ে আবার চলেও গেল। কেন? কিন্তু তিন-তিনটে বছর আপনাকে নিয়ে কাটাল কেন? ইয়ে কৌন সা জসবাত হুয়া থা? সুকর হ্যায় আল্লা কা, আজ আপনার স্মৃতি ফিরে এসেছে। কনগ্র্যাচুলেশন কমান্ডার।'

পরাণ চুপ করে থাকে। এখন তার সব মনে পড়ে গেছে। সে খালি রশিদকে বলতে পারছে না—বেওকুফ, শুধু আজ নয়। দু-বছর আগেও একবার তার স্মৃতি ফিরে এসেছিল। সে দিনটাও এইমাত্র তার মনে পড়ে গেছে।

সেই রাতেও স্বপ্ন দেখে ধড়মড় করে উঠে বসে ছিল। অপরিচিত পরিবেশ। প্রথমে মনে হয়েছিল, আফগানিস্থানের কোনও আন্ডারগ্রাউন্ড বাঙ্কার। তারপর দেখে, একটা সাদা আলো ঢুকছে। বেড়ার ঘরের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো। আর সে ওই ঘরে একটা খাটে শুয়ে।

কী করে হল? সে তো জম্মু থেকে শ্রীনগর যাওয়ার একটা বাসে ছিল! এখানে এল কী করে? অচেনা আতঙ্কে তার গলা শুকিয়ে এল। তারপর ভালো করে তাকিয়ে দেখে, পাশে এক মহিলা শুয়ে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

অন্ধকারে ঝুঁকে পড়ে মহিলাকে সে দেখতে যায়। সেই সময় মহিলার চোখ খুলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল আতঙ্কে মহিলার মুখটা চেপে ধরে। মহিলা কিছু বলতে চাইছিল। সে আরও জোরে মহিলার মুখ চেপে ধরে। মহিলা আপ্রাণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তার মধ্যে তখন অসুরের শক্তি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা সময় সে দেখে, মহিলা শান্ত হয়ে গেছে। বুঝতে পারেনি, মুখ চেপে ধরতে গিয়ে সে মহিলার ঘাড়টাই ভেঙে দিয়েছে।

প্রচণ্ড ঘামছে সে। এরকম পরিস্থিতির সঙ্গে সে অভ্যস্ত। কিন্তু এ-জায়গাটা কোথায়?

সে ঘর থেকে বেরোয়। অজ গ্রাম। চারিপাশ দেখে নিয়ে একসময় সে ঘরে ঢোকে। বডিটা লোপাট করতে হবে। ঘরে দুটো তোরঙ্গ। একটা খালি করে আরেকটায় কাপড়চোপড় ঢোকায়। তার পরে খালি তোরঙ্গে মহিলার শরীরটা ঢোকায়। এরমধ্যে সে একটা কুপি জ্বালিয়ে নিয়েছে। তোরঙ্গটা বন্ধ করে। দাওয়ার পাশ থেকে কোদালটা তুলে নেয়। তোরঙ্গটা কাঁধে নিয়ে, একটু দূরেই কচুবনটার দিকে এগিয়ে যায়।

আকাশ ফর্সা হতে চলেছে। কচুবনের সাতহাত নীচে বডিসমেত তোরঙ্গটা স্থান পেয়ে গেছে। মাটি চাপা দেওয়া হয়ে গেছে। পচা ডোবাতে হাত-পা ধুয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে এগোতে যায়। কিন্তু ভিজে পা পিছলে গেল। মাথাটা গিয়ে ঠিকরে পড়ল পুকুরের সামনের একটা পাথরে।

পরের দিন পরাণ মণ্ডল নিজেকে আবিষ্কার করে পচাপুকুরের ধারে। কেমন করে সে এখানে এসেছিল, তার আর মনে পড়েনি। ঘরে ফিরে সে প্রতিমাকে খুঁজেছিল। পায়নি। থানার দারোগাকে বলেছিল, তার বউ হারিয়ে গেছে।

রশিদ উঠে দাঁড়াল, 'কমান্ডার। রাত থাকতে থাকতে চলুন, বেরিয়ে যাই।'

পরাণ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার বলে, 'মেজর রশিদ। আমি বেঁচে আছি, এটা হেড কোয়ার্টার জানে?

রশিদ বলে, 'পাগল! আমি যে বেঁচে আছি সেটাও জানে না কেউ। আমি বেঁচে আছি জানলে ভাববে আমি লিডারশিপের লোভে আপনাকে মেরেছি বা ধরিয়ে দিয়েছি। এই পাঁচ বছর আমিও তো পালিয়ে বেড়াচ্ছি। চলুন, এবার জানানোর সময় এসেছে।'

বলতে-বলতে হঠাৎ রশিদের মুখ সাদা হয়ে গেল। কারণ সাইলেন্সার দেওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিভলভারটা এবার শূন্যে! নলটা তার দিকে।...

কচুবনের মাটিটা খুব একটা শক্ত নয়। সাতহাত মাটি খুঁড়তে বেশি সময় লাগেনি পরাণ মণ্ডলের। দ্বিতীয় তোরঙ্গটাও মাটির নীচে গেল। মাটি চাপা দিয়ে, পচা ডোবায় হাত-মুখ ধোয়। তারপর ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

সকাল হচ্ছে। আজ আবার হাটবার। হাটে যেতে হবে। দোকানের জিনিসপত্র কিনতে হবে। বেড়াটা ভেঙে গেছে। সেটার মেরামত করতে হবে। হাঁস-মুরগিগুলোর আর একটু যত্ন নিতে হবে।

ভাবতে ভাবতে চলছিল। বেখেয়ালে মাটির ঢিবিটায় পা পড়ল। পা অনেকটা ডুবে যায়। পরাণের মনে পড়ে যায়, প্রতিমা বলত 'মানুষ হল গে মাটির মতো। যেমন ছাঁচে ফেলবে তেমন রূপ নেবে।'

পরাণের শরীরটার মধ্যে কী যেন হতে শুরু করে। চোখদুটো বারবার ঝাপসা হয়ে আসছে। রশিদ বলছিল, 'কেন আপনার দুশমন ওই জেনানা পাহাড়ের খাদ থেকে স্মৃতিহীন আপনাকে বাঁচিয়ে সরকারের হাতে না দিয়ে এতগুলো বছর এখানে রেখে দিয়েছিল—তা বুঝতে পারিনি। কৌন সি জসবাত? কী সেই আবেগ? কী সেই অনুভূতি?'

পরাণের শরীরময় এখন কী যে হচ্ছে, পেটটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠছে, গলার কাছে বাষ্প দলা পাকিয়ে উঠছে।

পরাণের মনে হল, এগুলো একই অনুভূতি, একই জসবাত।

এই অনুভূতিটার নাম সে জানত। কিন্তু এখন কিছুতেই আর মনে পড়ছে না। তার যা ভুলো মন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

বরুণ বেঁচে গেল

বলটা সোজা গোল পোস্টের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

'গোল!'

চিৎকারটা উঠল ঠিকই। কিন্তু বিজয় উল্লাসের গর্জনের মতো নয়, বিদ্রুপের মতো। কারণ ঘটনাটা তাই।

বলটা অনেকক্ষণ আমাদের গোল পোস্টের সামনেই ঘোরাঘুরি করছিল। আমরা প্রাণপণে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করছিলাম। আমরা মানে আমাদের টিম। চন্দন তো ডিফেন্ড করতে গিয়ে একবার আছাড়ও খেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরই মধ্যে ব্যাটা বরুণ, যে কিনা ছিল মাঠের অপর প্রান্তে এবং যে কিনা আমাদের টিমেরই ফরোয়ার্ড, হঠাৎই দৌড়ে এসে বলটাকে কোনওমতে বাগিয়ে নিল এবং সজোরে একটা শট নিল। দমবন্ধ করে দেখলাম, বলটা সোজা আমাদের গোলেই এসে ঢুকল! সেমসাইড গোল।

সবাই বরুণের দিকে তাকিয়ে। খেলা শেষ হতে আর এক মিনিট বাকি। গোটা খেলায় এই একটাই গোল হয়েছে। তাও সেমসাইড। ফুটবল টুর্নামেন্টের এটা ফাইনাল ম্যাচ। আমাদের টফি পাওয়া হল না।

চন্দন একটা আধলা ইট নিয়ে বরুণের দিকে তাড়া করল। সারা মাঠ হাসছে। কিন্তু আমি তো চন্দনকে চিনি। ওর যা মাথা গরম! ও নিশ্চয়ই একটা রক্তারক্তি কাণ্ড করেই বসবে।

আমি আর রাজা দৌড়ে গিয়ে চন্দনকে আটকালাম। চন্দন বরুণকে মাটিতে ফেলে ইটটা বরুণের মাথায় মারতে যাচ্ছিল, আমি চন্দনের হাতটা ধরে ফেলেছিলাম।

বরুণ বেঁচে গেল।

আমাদের গ্রুপের সবারই কোনও না কোনও বিশেষ গুণ ছিল। রাজা ভালো ক্রিকেট খেলত, চন্দন ভালো ফুটবল, অনিন্দ্য ভালো ছবি আঁকত, আমি গান গাইতাম।

একমাত্র বরুণেরই সেই অর্থে কোনও গুণ ছিল না। অন্তত সেইভাবে গুণের মাপকাঠি সাজালে। তবে বৈশিষ্ট্যের কথা যদি বলা হয়, তবে বরুণের একটা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ল কিছুদিন বাদে।

আমরা তখন কিশোর। ফুটবল-ক্রিকেট ইত্যাদি খেলতে খেলতে বোর হয়ে গেছি। হঠাৎ একদিন বাপ্পা বলল, সে নাকি সাঁতার সুকলে জয়েন করেছে। এবং নিয়মিত সাঁতার শিখছে। ব্যস, আমরা নিশ্চিত হলাম, সাঁতার না শিখলে জীবন বৃথা।

সবার নজরে তখন টালা পার্কের পুকুর। নতুন উত্তেজনার সন্ধানে আমরা সবাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরিয়া! কোনও সুকলে ভর্তি নয়, বাপ্পাই আমাদের টেনার। গলা জলে কী করে ভেসে থাকতে হয়, তারপর কী করে এগিয়ে যেতে হয়, সবই শিখতে লাগলাম। সপ্তাহখানেক পরে আমরা মোটামুটি সাঁতার শিখেই গেলাম। এমনি সাঁতার, চিত-সাঁতার, ডুব-সাঁতার সবই।

বরুণের বৈশিষ্ট্য বোঝা গেল ডুব সাঁতারের সময়। আমরা ডুব-সাঁতারে তখন রপ্ত হয়ে গেছি, কেউ একটু বেশি, কেউ একটু কম সময় জলের নীচে থাকতে পারছি। একদিন দেখলাম, বরুণকে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ সে আমার পাশেই ছিল, ডুব দেবার পরে ও ভ্যানিশ!

আমাদের মাথায় হাত। তন্নতন্ন করে সবাই জলের নীচে-ওপরে খুঁজে চলেছি। আমাদের হাত-পা ঠান্ডা।

বাপ্পা প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'আমি তো খুনের দায়ে পড়ে যাব।'

চন্দন বিরক্ত হয়ে বলে, 'তুই কেন পড়বি?'

বাপ্পা বলে, 'আরে, আমিই তো তোদের আনথরাইস্ড টেনার।'

দশ মিনিট ধরে আমরা পনেরো জন গোটা পুকুরটা তন্নতন্ন করে খোঁজার পরে যখন ক্লান্ত, তখন দেখি ভুস করে আমার সামনে বরুণ উঠে এল। আমরা আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম!

কিন্তু সেটা প্রাথমিক রিঅ্যাকশন। তারপরই রাগে ওর চুলের মুঠি চেপে ধরল চন্দন, 'শালা, এতক্ষণ কোথায় ছিলি?'

বরুণ নির্বিকার মুখে বলল, 'জলের নীচে।'

চন্দন এবার আর নিজেকে সামলাতে পারল না। ওর গলা টিপে ধরল। সবাই অনেক কষ্টে চন্দনের হাত থেকে বরুণকে ছাড়ালাম।

ও বেঁচে গেল।

দিন কেটে যেতে থাকে সুকলের সিলেবাসের পাতায়, রোঁয়া ওঠা মাঠের ধুলোমাখা ফুটবলে ও নানান খেলায়।

টালাপার্কের পুকুরে অবিশ্বাস্যভাবে বরুণের জলের নীচে দশ মিনিট থাকা দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাঁতার-কোচ দেবাদা বললেন, 'এ ব্যাটার নিশ্চয়ই ফোলডিং ফুসফুস আছে। জলের নীচে দমবন্ধ করে তিন মিনিটের বেশি কেউ থাকতে পারে না।'

সঙ্গে সঙ্গে খেলাপাগল চন্দনের মাথায় একটা আইডিয়া এল। আমাদের কজনকে নিয়ে বসে গম্ভীরভাবে বলল, 'দ্যাখ, যদি বরুণকে নিয়ে এবার কবাডি টুর্নামেন্টে নাম দিই তাহলে আমাদের কেউ রুখতে পারবে না।'

খেলাধুলোয় বরুণ একেবারে আতাক্যালানে। কিন্তু চন্দনের প্রস্তাবটা সবাইকে চমকে দিল। আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম, 'হুররে!' বরুণের অফুরন্ত দম আমাদের টুর্নামেন্টে জিতিয়েই ছাড়বে।'

আমরা ঘটা করে টুর্নামেন্টে নাম দিলাম। কিন্তু জেতা তো দূরের কথা, প্রথম রাউন্ডেই হেরে গেলাম। আমাদের তুরুপের তাস, অন্ধের যষ্ঠি, বিধবার আধুলি বরুণই আমাদের ডোবাল! তিরিশ সেকেন্ডও দম চেপে থাকতে পারল না।

চন্দন প্রথম দুদিন গুম হয়ে বসে রইল। তৃতীয় দিনে বরুণকে সাইকেল চালাতে দেখে আর ঠিক থাকতে পারল না। মারল সাইকেলের পেছনে কষে এক লাথি।

বরুণ ছিটকে পড়ল রাস্তায়। চন্দন ওর বুকের ওপর বসে কিল-ঘুষির ঝড় তুলল। আমরা কেউ তখন ছিলাম না। বয়স্কদের একটা গ্রুপ বসে দাবা খেলছিল পাড়ার রকে। বরুণকে মার খেতে দেখে তারা ছুটে এসে চন্দনকে থামাল।

তাই বরুণ ফের বেঁচে গেল।

এক কোচিং-এ পড়তাম আমরা জনা আটেক। একদিন বাংলা পড়াতে পড়াতে মহাভারতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনুপস্যার আমাদের বললেন, 'বল তো বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—এর মানে কী?'

আমরা এককথায় উত্তর খুঁজছি। এমনসময় ডাকু বলে উঠল, 'যো জিতা ওহি সিকন্দর।'

অনুপবাবু চোখ পাকিয়ে উঠলেন, 'চ্যাংড়ামি হচ্ছে?'

আমরা হেসে অস্থির। বরুণ হঠাৎ শান্ত গলায় বলল, 'সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুপবাবু অসহায়ভাবে বললেন 'বাবা বরুণ, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা আর সারভাইভাল অফ দা ফিটেস্ট কী করে এক হল? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা মানে বীরই পৃথিবীকে ভোগ করার অধিকার রাখে আর সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট মানে যোগ্যতমরাই অভিযোজনে সফল হয়। দুটো কি এক হল?'

বরুণ আরও শান্ত গলায় বলল, 'এক নয় কি স্যার? বীর মানেই তো যোগ্যতম। আর অভিযোজন মানেই তো পৃথিবীকে ভোগ করা।'

অনুপবাবু এবার রেগে হাতের ডাস্টার ছুঁড়ে মারলেন বরুণের দিকে। ডাস্টারটা লক্ষ্যচ্যুত হল।

বরুণ বেঁচে গেল।

এ সবই ছোটবেলার কথা। সব কিছু মনে থাকবে, তা বাধ্যতামূলক নয়। আবার সবই বিস্মৃতির আঁধারে হারাবে, সেটাও বাধ্যতামূলক নয়। বিশেষ করে যখন স্মৃতির কুয়াশা ঢাকা চরিত্রগুলো সশরীরে সামনে এসে দাঁড়ায়।

আমার এখন গান গেয়ে একটু নাম হয়েছে। লোকজন চেনে। একটু-আধটু লেখালেখি করি। গল্পকার হিসেবেও একটু পরিচিতি হয়েছে।

কিন্তু অনেকের ধারণা, গানটা ভালোই করি, কিন্তু গল্পগুলো নির্ঘাত অন্য কেউ লিখে দেয়। আমি এখন বদ্ধপরিকর, গল্পকার হিসেবেও লোকের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করেই ছাড়ব!

সেই কারণেই কলেজ স্ট্রিট চত্বরে ঘোরাঘুরি করছিলাম। হাতে এক ঘণ্টা সময় ছিল। প্রকাশক বন্ধুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট তিনটের সময়। ভাবলাম কফি হাউসে গিয়ে বসি। বহুদিন যাওয়া হয়নি।

এই সময় বরুণের সঙ্গে দেখা। হাতে একটা কালো ব্রিফকেস, সাদা জামা, কালো প্যান্ট, গলায় টাই, চোখে চশমা। আমায় দেখে কান এঁটো করা হাসি হেসে উঠল।

আমার মনটা কেমন হয়ে গেল। পিছিয়ে গেলাম বহু বহু যুগের ধূসর পথ ধরে। বরুণ বলল, 'আমার কী ভাগ্য!' সুপারস্টার কলেজ স্ট্রিটের রাস্তায়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওকে জড়িয়ে ধরি। গিয়ে বসলাম কফি হাউসে। ম্যানেজার চিনতে পেরে, আমাদের আলাদা বসার ব্যবস্থা করলেন দোতলায়।

আমাদের কথা শেষই হচ্ছিল না। শেষ হচ্ছিল না আমাদের হাসি। কারণ স্মৃতি সততই সুখের। কফি হাউসের দোতলায় আমাদের টেবিলটার চারপাশে তখন অদৃশ্যভাবে পাক খাচ্ছে আমাদের ছেলেবেলার সুকল...কোচিং সেন্টার... খেলার মাঠ...আরও অসংখ্য অজস্র মুখ।

এক সময় ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী খাবি? মাটন না চিকেন প্রিপারেশন?'

ও বলল, 'মাশরুম।'

আমি তো অবাক, 'সে কিরে, এত কিছু ছেড়ে শেষে মাশরুম?'

ও বলল, 'আর কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। মানে স্যুট করে না।'

আমি একটু চিন্তিত হয়ে বললাম 'শরীর-টরীর ঠিক আছে তো?'

ও বলল, 'না, না, পাক্কা আছে। প্রেশার, সুগার, L.F.T, ক্রিয়েটিনিন, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ, সব ঠিক আছে। মায় চোখের পাওয়ারও ঠিক আছে।'

আমি বললাম, 'তাহলে চোখে চশমা পরেছিস কেন?'

ও বলল, ওটা অফিসের সাবর্ডিনেটদের সামনে গাম্ভীর্যের জন্য।'

আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম।

এক সময় ওকে প্রশ্নটা পেড়েই ফেললাম, 'হ্যাঁ রে, তুই এখনো জলের নীচে দশ মিনিট থাকতে পারিস?'

অদ্ভুতভাবে ও এড়িয়ে গেল। তারপর খাবার এসে গেল। আমরাও খাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে গেলাম।

এর মধ্যে জেনে নিলাম, ও একটি বেসরকারি অফিসে উচ্চপদস্থ কম.। আলিপুরে থাকে। বিয়ে করেছে। এখনও বাচ্চাকাচ্চা হয়নি।

এদিকে সমস্য দেখা দিল। বেশ কিছু মানুষ জানতে পেরে গেছে আমি ওপরে। তারা একটু একটু করে ভিড় বাড়াতে শুরু করেছে সেলফি তোলার তালে। এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ আর অটোগ্রাফ চায় না।

বরুণকে বললাম, 'চল এবার পালাই।'

একে অপরের ফোন নাম্বার নিয়ে নিয়েছিলাম। আমি ভিড় ঠেলে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, বরুণ এসে আমার গা ঘেঁষে বলল, 'এখন দশ মিনিট নয় রে! আমি ২৪ ঘণ্টা জলের নীচে থাকতে পারি।'

আমি মুখ ঘুরিয়ে ওকে দেখতে গেলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল, এই গাড়োয়ালি রসিকতার জবাবে ওকে দুটো কড়া গালি দিই!

কিন্তু ভক্তদের ভিড় ওকে আড়াল করে দিল। ও বেঁচে গেল।

আরও বছর দশেক পার হয়ে গেছে। গাইয়ে হিসেবে আমি আরও প্রতিষ্ঠিত। লেখক হিসেবে এখনো গুঁতিয়ে চলেছি আমার প্রকাশকবন্ধুকে। কিছু লেখা ছাপে, কিছু লেখা ছাপে না। খালি বলে ভালোবাসার গল্প লেখো।

আমার আবার ওইসব আসে না। আমি মুক্ত থাকতেই ভালোবাসি পাখির মতো।

একথা শুনে বন্ধু বলেন, 'পাখির মতো হতে চাও, তা ভালো। কিন্তু জানো কি, সব পাখিরাই আগে সরীসৃপ ছিল। ডানা পরে গজিয়েছে। প্রথমে আমাদের মতো সরীসৃপদের জীবনটা একটু কাটাও! তারপর না হয় ডানা মেলো।'

এ ধরনের লেগ পুলিং-এ আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি দশ বছরে।

সেদিন দুপুরে রবীন্দ্রসদনে একটা শো ছিল। শীতকাল। চারটে নাগাদ বাইরে বেরিয়ে দেখি, শহরটাকে অন্ধকার ঢাকতে চলেছে। গাড়ির জন্য দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখি, সামনে দিয়ে বরুণ চলে যাচ্ছে। আমি চিৎকার করে ডাকলাম। ও দাঁড়াল। একমুখ হাসল। কিন্তু সে হাসি যেন কেমন যন্ত্রণামাখা।

গাড়ি এসে গেছে। আমি বললাম, 'ওঠ গাড়িতে।'

বাধ্য ছেলের মতো গাড়িতে উঠে বসল। দেখলাম, ওর জামাকাপড় অপরিচ্ছন্ন, গালেও খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সব মিলিয়ে কেন যেন মনে হচ্ছিল ও ভালো নেই।

আমার খিদে পেয়েছিল। গাড়িতে খাবার প্যাকেট ছিল। বললাম, 'আমার খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খিদে পেয়েছে। তুইও খা।'

ও বলল, 'আমি তো মাশরুম ছাড়া কিছুই খাই না। মানে স্যুট করে না। তুই খা।'

খেতে খেতে প্রশ্ন করি, 'তোর এরকম দশা কেন? কী হয়েছে?'

একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমার বউ আমায় ছেড়ে গেছে।'

ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'কবে? কেন?'

বরুণ ঘাড় নীচু করে বলল, 'বছর দুয়েক।'

'কিন্তু কেন?'

'অনীতার নাকি আমার সঙ্গে থাকতে ভয় করে।'

'তোকে ভয় পাবার কী আছে? তুই তো নির্বিরোধী একজন লোক।'

বরুণ জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে। তারপরে বলে, 'আমি নাকি চোখ খুলে ঘুমোই।'

'অনেকেই ঘুমের সময় আধবোজা চোখে ঘুমোয়।'

বরুণ অস্থিরভাবে বলে, 'তুই ঠিক বুঝবি না। আর বুঝবিই বা কী করে? কারণ আমিও বুঝতে পারছি না, আমার এরকম কেন হচ্ছে। তুই জানতে চেয়েছিলি না আমি জলের নীচে কতক্ষণ থাকতে পারি! মনে আছে, দশ বছর আগে আমি বলেছিলাম ২৪ ঘণ্টা। আজ দশ বছর পরে বলছি, আমি এখন ৪৮ ঘণ্টা জলের নীচে থাকতে পারি।'

নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলাম। প্রচণ্ড রাগে আমার মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছিল। শান্ত করতে করতে বললাম, 'তুই জানলি কী করে? তুই কি টালাপার্কের পুকুরে কি হেদুয়া বা লেকে ডুব দিয়ে পরীক্ষা করিস নাকি স্টপ ওয়াচ নিয়ে?'

বরুণ ক্লান্ত গলায় বলল, 'আমি যা মাইনে পাই তাতে খেয়ে হোক না খেয়ে হোক এমন বাড়িই ভাড়া করে থেকেছি, যেখানে বাথটব আছে।'

আর রাগ সামলাতে পারলাম না। বললাম, 'তোর বউ তোকে ছেড়ে গিয়ে একদম ঠিক করেছে। নিজের বিশেষত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে কেউ যে এরকম ঢপ মারে এটা ভাবতেই পারছি না! বউ এর কাছে হিরো হতে গেছিলি না? ৪৮ ঘণ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জলের নীচে থাকতে পারিস...চোখ খুলে ঘুমোস! বেশ হয়েছে! এবার বোঝ।'

ও বলল, 'গাড়ি থামা।'

তারপর নামতে নামতে বলল, 'বিশ্বাস করলি না তো? শোন, আমার চোখের পাতাও পড়ে না। তাই ফটোক্রোমাটিক চশমা পরতে হয়।'

রাগে কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এই ফাঁকে বরুণ সিগনালে নেমে গেছে। খিস্তি দেব বলে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছি। সিগনালটা খুলে গেল, গাড়ি স্টার্ট নিয়ে নিল।

ও বেঁচে গেল।

আরও বছর দুয়েক পর। কাঁথিতে একটা অনুষ্ঠান করতে এসেছিলাম।... বৃষ্টির দরুন অনুষ্ঠানটা করা গেল না। আয়োজকরা অনুরোধ করলেন, একটা দিন যদি থেকে যাই। বৃষ্টি থামলে অনুষ্ঠানটা করেই যেন যাই।

রাজি হয়ে গেলাম। সত্যিই তো, একটা অনুষ্ঠান না হলে অনেক টাকার ক্ষতি। থেকে গেলাম।

কিন্তু পরের দিনও বৃষ্টি কমল না। অনুষ্ঠান হল না। আয়োজকদের বললাম, 'আর থাকা সম্ভব নয়। আজকেও বৃষ্টি কমবে বলে মনে হচ্ছে না।'

আয়োজকরা বুঝলেন, আমার কথার মধ্যে সত্যতা আছে। ওরাও আপত্তি করলেন না।

গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ মনে হল, একবার শঙ্করপুর ঘুরে গেলে কেমন হয়! শঙ্করপুর আমার খুব প্রিয় একটা জায়গা, ভীষণ নির্জন। বহুবার শঙ্করপুর এসেছি, উপভোগ করেছি নির্জন বিচ। কাজের চাপে অনেক দিন আসা হয়নি। হঠাৎ সুযোগ এসে যাওয়ায় মন খুব চঞ্চল হয়ে উঠল।

পৌঁছে গেলাম শঙ্করপুরে। ওখানে আমার একটা বাঁধা হোটেল আছে সান্ডি বে। এলে ওই হোটেলেই থাকি। সবাই চেনে। যাওয়ামাত্র ম্যানেজার আপ্যায়ন করে বললেন, 'কী ভাগ্য! এই দুর্যোগে আপনি? হোটেলে তো কোনও বোর্ডারই নেই।'

'দরকার কী? আমি তো একাই একশো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যানেজার হেসে উঠলেন।

ঘরে মালপত্র রেখে নীচে এসে ম্যানেজারকে বললাম, 'যাই, একটু নীচে ঘুরে আসি।'

ম্যানেজার অবাক, 'বলেন কী! এই বৃষ্টিবাদলায় নীচে?'

'আরে মশাই! এ অবস্থাতেই তো সমুদ্রের আসল রূপটা দেখা যাবে।'

সবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে অবশেষে বেরিয়ে পড়লাম। বিচে কেউ নেই। উত্তাল সমুদ্র। প্রবল হাওয়া...মুষলধারে বৃষ্টি এবং শুধু আমি।

সত্যি, এরকম দৃশ্য না দেখলে জীবন বোধহয় অসম্পূর্ণ থাকত।

অনেকক্ষণ সমুদ্রের আগ্রাসী রূপ দেখছিলাম। হঠাৎই মনে হল, তীরে আমি একা নই। দূরে তাকিয়ে দেখলাম, একটা লোক এগিয়ে আসছে। বিন্দু থেকে প্রমাণ সাইজের হল।

এ কী! এ যে বরুণ! মাথায় কাঁচা পাকা চুল, মুখ ভর্তি দাড়ি। কিন্তু বিবস্ত্র। শরীরে একটা সুতোও নেই!

আমায় দেখে বরুণ একগাল হেসে উঠল, 'যাক, তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একেই বলে মনের টান। আজকে একটা সত্যি কথা বলছি তোকে। আমি না ছোটবেলা থেকেই তোকে খুব পছন্দ করতাম। কোনওদিন বলে উঠতে পারিনি। আজ ঠিক বলে গেলাম।'

'কিন্তু এ কী অবস্থা তোর! জামাকাপড় পরিসনি কেন?'

বরুণ হেসে বলল, 'জামাকাপড় আর কোন কাজে লাগবে? এবার তো যেতে হবে।'

প্রচণ্ড হাওয়া ও বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কোথায়? কোথায় যেতে হবে তোকে?'

ও সমুদ্রের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, 'জলে।'

চমকে উঠলাম। নিশ্চয়ই ও পাগল হয়ে গেছে। ওর মতলব ভালো নয়। চিৎকার করলাম, 'পাগলামি করিস না! এখন সমুদ্র মানে সাক্ষাৎ মৃত্যু।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর জবাব ভেসে এল, 'হয়তো বা জীবন।'

বলেই ও উত্তাল সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেল দৃপ্তপায়ে।

আমি চিৎকার করতে লাগলাম, 'হেল্প! হেল্প! কেউ ওকে ধরুন।'

এদিক-ওদিক নুলিয়াদের খুঁজলাম। কেউ কোথাও নেই। নির্জন সাগরবেলা আমার ব্যর্থতায় যেন মাড়ি বের করে হাসছে। বরুণ এগিয়ে যাচ্ছে...দেখতে পাচ্ছি...আস্তে-আস্তে সমুদ্রের বড় বড় ঢেউয়ের আড়ালে ও হারিয়ে গেল।

তারপর?...

তারপর...পৃথিবীতে ৩৮৮ দিন ধরে বৃষ্টি হল। পৃথিবী ডুবে গেল। আর বরুণ?...

বরুণ বেঁচে গেল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

কালযবন

পার্কের বেঞ্চটায় বসে আছে জীবেশ। একপাল লোক হন হন করে হাঁটছে, শরীর চর্চার জন্য। তাদের মধ্যে অধিকাংশই বুড়ো-বুড়ি, আসন্ন মৃত্যুর প্রতিরোধে বদ্ধপরিকর। এবং অবশ্যই আতঙ্কিত।

বিকেলের আলোয় পার্কটাকে কেমন নিভে যাওয়া উনুনের ছাই-এর মতো লাগছে, যেন আর জ্বলবে না! বসে বসে একমনে ভাবছে জীবেশ, নাহ্! আর বোধহয় উঠে দাঁড়ানো যাবে না। সব পথ বন্ধ।

জীবেশের বয়েস পয়তাল্লিশ। পেশায় বেকার, অন্তত বিগত দু-বছর ধরে। অথচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিগ্রির ভাঁড়ারে তার অনেক কিছুই ছিল, অভিজ্ঞতাও ছিল যথেষ্ট। ছিল ভালো চাকরি, ফ্ল্যাট, গাড়ি, স্ত্রী, পুত্র। আজ সব কিছু হারিয়ে সে প্রায় পথে বসেছে। এখন আক্ষরিক অর্থেই সে পথের ধারে এই পার্কটায় বসে।

তার এই পার্কটায় বসে থাকার কথা নয়। রোজগারের ধান্ধায় তাকে সারাক্ষণ দৌড়ে বেড়াতে হয়। আসলে কাল একটা ফোন আসে তার সস্তার সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইলে। ওপাশের লোকটা তার নাম বলেনি। শুধু বলেছিল, বিকেল পাঁচটার সময় এই পার্কটায় আসতে। এলে নাকি তারই লাভ হবে। আর কোনও কথা বলেনি।

জীবেশ একটু অবাক হয়েছিল। নিজের লাভের কথা ভেবে অবশেষে চলেই এসেছে পার্কটাতে। কিন্তু দশ মিনিট হয়ে গেল, কেউ তো এল না! আরও দশ মিনিট বাদে সে যখন ভাবছে, কেউ তার সঙ্গে মশকরা করেছে, এমন সময় সাদা চুলওয়ালা একজন মানুষ তার সামনে এসে দাঁড়ালেন, তুমি জীবেশ তো?

জীবেশ মাথা নেড়ে জানায়, হ্যাঁ।

ভদ্রলোক বেঞ্চটায় তার পাশে বসেন। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি, চোখে চশমা। বয়েস ষাট তো হবেই। তার বেশিও হতে পারে।

—বাবা জীবেশ, আমায় চিনতে পারছ?

জীবেশ মাথা নাড়ে, না।

—আমি যতীনকাকা, তোমাদের প্রতিবেশী। তোমার বাবার খুব ভক্ত ছিলাম। ছোটবেলায় আমিই তোমায় মাঠে নিয়ে গিয়ে খেলাতাম, এই কাঁধে চড়িয়ে...

জীবেশ ভ্রু কুঁচকে ভাবার চেষ্টা করে। মনে পড়ে না। ছোটবেলার কথা সে মনে করে না। করতে চায়ও না।

একটা ছায়াময় শৈশব, কৈশোর সে ভুলে যেতে চায়।

যতীন এবার হাসেন, মনে নেই তো? নাকি মনে করতে চাও না? সত্যি, মানুষ এক অদ্ভুত জীব, নিজের ভুল-ভ্রান্তিগুলোর জন্য পসিটিভ যুক্তি তৈরি করে। যখন পারে না তখন ভুলে যায়। নয়তো ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবেশ এবার বিরক্তি-মেশানো গলায় বলে, আমায় এখানে ডেকেছেন কেন? আমার সময়ের দাম আছে।

—দাম তো আছেই, তবে তা কানাকড়ি নয় তাও আমি জানি।—যতীন হাসেন।

—মানে? আপনি আমায় অপমান করছেন!

—সে ইচ্ছে বা প্রবৃত্তি কোনওটাই আমার নেই। যে মানসম্মান খুইয়ে পথের ভিখিরি তাকে অপমান করার মতো নিষ্ঠুর আমি নই।

একটু থামেন যতীন। তারপর সিগারেটের একটা প্যাকেট এগিয়ে দেন জীবেশের দিকে, একটা সিগারেট খাবে? ভালো সিগারেট। বিদেশি। এখন তো আর এসব খেতে পাও না। নাও না, পুরোনো অভ্যেস...

জীবেশ সিগারেটটা নিয়ে ধরায়। বুক ভরে ধোঁয়া টানে। এক সময় মাথা ঠান্ডা করে বলে, আপনি আমার সম্পর্কে এত কিছু জানলেন কেমন করে?

যতীন বলেন, এত কী? সব—সবটুকুই জানি।

জীবেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

—তোমার নাম জীবেশ রায়। তোমার বাবা জীমূতবাহন একজন ফুটবলার ছিলেন। পরে ব্যাঙ্কে চাকরি নেন। মা কাকলি উচ্চশিক্ষিতা গৃহবধূ ছিলেন। তুমি তাঁদের একমাত্র সন্তান। অবশ্য কুসন্তান বলাই ভালো। মেধাবী ছাত্র ছিলে। কিন্তু বদসঙ্গে পড়ে ছোটবেলা থেকেই নেশা ধরে ফেললে। তার জন্য অর্থের প্রয়োজন। তাই মায়ের গয়না, বাবার মানিব্যাগ সব দিকেই তোমার কুনজর পড়ল।

এই পর্যন্ত বলে একটু দম নিলেন যতীন। তারপর ফের শুরু করলেন, তোমার বাবা ছিলেন পাড়ার হিরো। তাই তোমার ব্যাপারে প্রথম প্রথম কেউ গা করেনি। কিন্তু পরে বিষয়টা এতটাই বড় আকার ধারণ করল যে তোমায় রিহ্যাবে পাঠানো হল। তুমি সেখান থেকেও পালিয়ে এলে। এরপর বেশ কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর বাবার ব্যাঙ্কের ক্যাশ থেকে টাকা চুরি করলে। বাচ্চা ছেলে ভেবে অফিসের লোকেরা তোমায় বাবার কেবিনে ঢুকতে দিয়েছিল। তোমায় বাঁচাতে তোমার বাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাকরিটা গেল। এরপরও কিন্তু তুমি থামলে না। এবার তুমি তোমার মামাতো বোনের সঙ্গে প্রণয়ঘটিত শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে। ব্যাপারটা জানাজানি হল। তোমার বাবা-মা এতদিন সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এবার পারিবারিক ক্ষেত্রেও কোণঠাসা হয়ে পড়লেন। তখন তাঁরা তোমায় শহরের বাইরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

এবার আবার কিছুক্ষণের বিরতি। তারপর, তুমি চলে গেলে ব্যাঙ্গালোরে। সঙ্গে গেলেন তোমার বাবা। মা রয়ে গেলেন কলকাতায়। সম্পূর্ণ একা,নিঃসঙ্গ। তোমার বাবা-মা জীবনে একদিনের জন্যও কখনও আলাদা হননি। এমনকী তোমার মা জীবনে একদিনের জন্যেও বাপের বাড়িতে থাকেননি। কেবলমাত্র তোমার মঙ্গলের জন্যে তাঁরা আলাদা হয়ে গেলেন।

তোমার বাবা ব্যাঙ্গালোরে একটা ক্লাবে কোচ হয়ে জয়েন করলেন। তুমি ভর্তি হলে ওখানকার হাইসুকলে। কিন্তু তবু তুমি নিজেকে বদলালে না। এক বিবাহিতা গুজরাটি মহিলার সঙ্গে নিজেকে জড়ালে এবং ব্যাপারটা এতটাই নোংরা করে তুললে যে ওই গুজরাটি পরিবারের লোকেরা তোমাদের বাড়িতে এসে চড়াও হল। তোমায় না পেয়ে তোমার বাবাকে এমন মার মারল যে তোমার বাবার প্যারালিসিস হয়ে গেল। তোমার বাবা হাসপাতালে ভর্তি হলেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল যতীনের। তিনি বলে চলেছেন, তুমি ইতিমধ্যে বিদেশে একটা স্কলারশিপ বাগিয়ে ফেলেছ। এক সপ্তাহের মধ্যে চলে গেলে লন্ডনে। একটিবারের জন্যও আর ফিরলে না দশ বছরের মধ্যে। কোনও খোঁজও নিলে না বাবা-মায়ের। যখন ফিরে এলে তখন তোমার বিশাল চাকরি, গাড়ি, বাড়ি, ঝাঁ-চকচকে বউ। পুরোনো জীবনের স্মৃতিদের সব আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছ। বউকে বলেছ, ছোটবেলায় তোমার বাবা-মা মারা গেছেন গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে। এর মধ্যে তোমার বাবা মারা গেছেন, দীর্ঘ আট বছর তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, তুমি কোনও খবরই নাওনি। কী, ঠিক বলছি তো?

জীবেশ মাথা নীচু করে বসে থাকে। এবার যতীন বলেন, এগুলো তো আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানি। কারণ আমি তোমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। কিন্তু এবার যা বলব, তুমি ভাববে এগুলো আমি জানলাম কী করে!

যতীন বলে চলেন, তুমি কলকাতায় এসে একটা বড় কোম্পানিতে জয়েন করলে। তোমাদের একটা ছেলেও হল—আকাশ। তুমি যখন দু-হাতে টাকা রোজগার করছ, তখন তোমার স্ত্রী একটা বুটিক খুলল। বহু নামীদামি লোকের সান্নিধ্যে এলে। তোমরা তখন আদর্শ দম্পতি। কেউ জানল না, তোমার সুখী দাম্পত্যের ইমারত দাঁড়িয়ে আছে দুজন অসুখী মানুষের কবরের ওপর।

কিছুক্ষণ থেমে আবার যতীন বলে চললেন, এর পরই তোমার জীবনে বিপর্যয় শুরু হল। চাকরির সুবাদে তোমায় হিল্লি-দিল্লি করতে হত।

একবার এক কর্পোরেট সেমিনারে তুমি মুম্বাই গেলে। পাঁচতারা হোটেলে এক সকালে তুমি আরও কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে বসে ব্রেকফাস্ট করছ, এমন সময় রিসেপশনে বিরাট হইচই! তোমার বিরুদ্ধে এক মহিলা অভিযোগ করেছে যে তুমি নাকি সারারাত জোর করে তার শ্লীলতাহানি করেছ। এমনকী তুমি তাকে সারারাত ধরে তোমার রুমে বেঁধেও রেখেছিলে। মহিলার পরনের ছেঁড়া জামাকাপড়ের কিছু টুকরো, কিছু দড়ি তোমার ঘরে পাওয়া গেল। তারপর থানা-পুলিশ, প্রেস, মিডিয়া —যাচ্ছেতাই কাণ্ড! তোমার কোম্পানি তোমায় বাঁচাতে জলের মতো টাকা খরচ করল। তুমি কোনওরকমে বেঁচে গেলে, কিন্তু চলে গেলে কোম্পানির ব্যাডবুকে।

—কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু ওই মহিলার সঙ্গে কিছুই করিনি। ওই মহিলাকে আগে কোনওদিন দেখিওনি আমি।

যতীন হাওয়া বাঁচিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, সেটাও জানি। ওই মহিলা টাকার বিনিময়ে তোমায় ফাঁসিয়েছে।

জীবেশ অবাক হয়ে বলে, জানেন?

—জানি। সব জানি। কিন্তু আমার বলা এখনও শেষ হয়নি। পুরোটা তোমায় শুনতে হবে। হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম—তুমি কোম্পানির ব্যাডবুকে পড়ে গেলে। তোমার স্ত্রীও তোমায় সন্দেহ করতে শুরু করল। এর কিছুদিন বাদে তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোম্পানির একটা গুরুত্বপূর্ণ ফাইল, যা ছিল কনফিডেনশিয়াল, হারিয়ে গেল তোমারই কেবিন থেকে। এবং ফাইলের সব তথ্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেল তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির হাতে। এদিকে তোমার ডেস্কে পাওয়া গেল পাঁচ লক্ষ টাকা। যার হিসেব তুমি দিতে পারলে না। এবার তোমার চাকরি গেল! জেল হল।

জীবেশ বলে, কিন্তু...কিন্তু...আমি কোনও ফাইল বিক্রি করিনি। আমার ড্রয়ারে কী করে টাকা এল তা-ও আমি জানি না। আমি সত্যিই নির্দোষ ছিলাম।

যতীন হাসেন, জানি। ওই ফাইল সরানো হয়েছিল। আর তোমার ড্রয়ারে টাকা রাখা হয়েছিল তোমার অজান্তেই।

—কিন্তু কেন?

—যাতে তোমার চাকরি যায়, জেল হয়। কিন্তু আমার কথা তো এখনও শেষ হয়নি।

জেল থেকে বেরিয়ে দেখলে আরেক সমস্যা। তোমার স্ত্রী তোমার বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা করেছে। তোমাদের দুজনের ছিল জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট। তোমার স্ত্রী তোমার সব টাকা তুলে নিয়েছে। তোমার স্ত্রীর বুটিক তখন মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে। যেহেতু ফ্ল্যাটটাও তোমাদের দুজনের নামে ছিল, তোমার আর ই.এম.আই. দেওয়ার ক্ষমতা নেই, তাই তোমার বউ ফ্ল্যাটটাও তোমায় দিয়ে লিখিয়ে নিল। তুমি আক্ষরিক অর্থেই রাস্তায় এসে দাঁড়ালে। একজন জেলফেরত দাগি আসামী, যার আবার মহিলাঘটিত দোষও আছে, তাকে কে চাকরি দেবে? তাই আজ এখানে, কাল ওখানে করেই তোমার দিন কাটছে। বাবা জীবেশ, ঠিক বলছি তো?

এই পর্যন্ত বলে থামলেন যতীন। একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলেন জীবেশের দিকে।

নিজেরটার ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবার শুরু করলেন, কিন্তু তোমার দুর্ভোগ যে এখনও শেষ হয়নি! মাসখানেক আগে তোমার ছেলের রক্তে আফিম পাওয়া গেল। তোমরা ভাবতে, সুকলের পড়ার চাপে ও ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু তোমার স্ত্রীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক মামা ডাক্তার। তিনি বললেন ওর ব্লাড টেস্ট করতে। রিপোর্টে তোমার ছেলের রক্তে আফিম পাওয়া গেল। বছর আটেক ধরে সে আফিমে আসক্ত। তোমার ছেলে এখন রিহ্যাবে।

জীবেশ এবার মরিয়া হয়ে বলে, বিশ্বাস করুন, এর জন্য কোনওভাবেই আমি দায়ী নই।

যতীন বলেন, বালাই ষাট! তুমি কেন দায়ী হবে? ওই আফিম তো ওকে একটু একটু করে চকোলেটে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে!...

জীবেশ বজ্রাহতের মতো যতীনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

যতীন এবার অদ্ভুত গলায় বলে ওঠেন, বাবা জীবেশ, তোমায় যদি 'কালযবন' নামে ডাকি তুমি কি রাগ করবে?

জীবেশ তোতলায়, কা...কালযবন! সে আবার কে?

যতীন বলেন, ওহ্! তুমি তো আবার বিলেতফেরত মানুষ! পৌরাণিক চরিত্রদের চিনবে কেমন করে? কালযবন ছিল জরাসন্ধের হিটম্যান। কৃষ্ণ কংসকে হত্যা করলে কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ ভীষণ রেগে গেলেন। বারবার আক্রমণ চালালেন মথুরায় কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হচ্ছিলেন। কৃষ্ণ প্রতিবারই পিছলে যাচ্ছিল।

একবার জরাসন্ধ কালযবনকে কৃষ্ণ বধের দায়িত্ব দিলেন। কালযবন প্রবল বিক্রমে আক্রমণ চালাল। কিন্তু কৃষ্ণকে হাতে পাওয়া গেল না কৃষ্ণ পালিয়ে বেড়াতে লাগল।

কালযবন কৃষ্ণের পিছু নিল। কৃষ্ণ পালাতে পালাতে একটা গুহার মধ্যে প্রবেশ করল ইচ্ছে করে। সেখানে হাজার বছর ধরে ঘুমিয়ে আছেন ঋষি মুচকুন্দ। গুহায় প্রবেশ করে কালযবন অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে ঋষিকে লাথি মেরে বসল। মুচকুন্দর ঘুম ভেঙে গেল। ঋষি ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকালেন। কালযবন ভস্ম হয়ে গেল।

তাই বলছিলাম, তুমিই একালের কালযবন। বুঝলে না, তাই তো? আসলে তোমায় কৌশলে তোমার কৃষ্ণরূপ পাপ নিয়ে গেল মুচকুন্দের সামনে। তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবলে, এ তো ঘুমিয়েই থাকবে। মারলে লাথি—ব্যস...!

জীবেশের অসহায়, অবাক দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে একটু থামলেন যতীন। তারপর বললেন, আসলে তুমি ভেবেছিলে শতাব্দীর পর শতাব্দী মুচকুন্দরা তো মায়া, মমতা, স্নেহ ইত্যাদির ঘুমে ঘুমিয়ে থাকে। এরা জাগে না, জাগবেও না। কিন্তু কখন কোন আঘাতে মুচকুন্দদের ঘুম ভাঙে তা ঈশ্বরও জানেন না! তুমি কী করে জানবে? তাই ভস্ম হয়ে গেলে।

জীবেশ বলে, এসব শুনিয়ে যন্ত্রণা দেবার জন্য কি আমায় ডেকেছেন?

যতীন বলেন, না রে বাবা, না। আমি তোমায় একটা জিনিস দিতে এসেছি খুব ইন্টারেস্টিং। এই নাও।

জীবেশ বস্তুটা হাতে নিয়ে বলে, এ তো একটা কৌটো!

—হ্যাঁ। এটা যিনি তোমায় দিতে বলেছেন, তিনি কাল মারা গেছেন। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, সুইসাইড করেছেন। আসলে তোমার এমন দুর্দশা তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না।

জীবেশ অবাক হয়ে বলে, এতে কী আছে?

—আফিম। এই আফিম-ই আট বছর ধরে তোমার ছেলের চকোলেটের সঙ্গে তার শরীরে গেছে। মৃত্যুর আগে তিনি আমায় বলেছিলেন এটা তোমায় দিয়ে বলতে যে এই বস্তুটা কম খেলে মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়। আর পুরোটা খেলে—বিনাকষ্টে মারা যায়! তা জীবেশ, এবার তো এটা তোমারই লাগবে, তাই না, আর হ্যাঁ? আজকে তোমায় পুলিশ অ্যারেস্ট করতে আসবে। কারণ যে সাইবার কাফেটাতে তুমি পার্টটাইম চাকরি করো, কাল রাতে সেখানকার দুটো কম্পিউটারই চুরি হয়ে গেছে। আর আজ একটু আগে তুমি যে-মেসে থাক, তার তোষকের নীচে চল্লিশ হাজার টাকা পাওয়া গেছে। সুতরাং বাবা জীবেশ! কৌটো তোমার সামনে! মৃত মানুষের শেষ ইচ্ছেটা এবার পূর্ণ করো।

জীবেশ আর্তনাদ করে ওঠে,—কে—? কে মারা গেছে?

—কেন, তোমার ছেলের সুকলের ক্লাসটিচার। মিসেস কাকলী রায়। তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একমাত্র গর্ভধারিণী মা!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

সেদিনটা এসেই গেল

অলক্ষুণে ফোনটাই মাথাটা গরম করে দিল। অফিস থেকে ফিরে ভালো করে স্নান করে বসেছিলাম টিভি দেখব বলে। আজ রাত এগারোটায় 'শোলে' দেবে। খাবারদাবার রেডি করে খেতে খেতে দেখব। বাসামাছের ফ্রাই আর গরম ভাতে মাখন।

সব রেডি করে খাবার টেবিলে রেখে জাস্ট খেতে বসেছি। টিভিতে ট্রেন এসে দাঁড়াল স্টেশনে। শুরু হল আর. ডি. বর্মন-এর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, ভূপিন্দর সিং-এর টুয়েল্ভ স্টিং গিটার, মনহারী সিং-এর ব্রাস সেকশন আর দ্বারকা দিভেচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যামেরার মায়াজাল।

অনেকেই ভাববেন, আমি এত খুঁটিনাটি জানলাম কী করে? পেশায় একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বই তো কিছু না। আসলে আমার আর একটা নেশা আছে। ফটোগ্রাফি। তারই ল্যাজ ধরে সিনেমা আর মিউজিক।

মিউজিক আমার রক্তে। মা ভালো গান গাইতেন। আমিও ছোটবেলায় তবলা বাজাতাম, একটু-আধটু গানও গাইতাম। বছর খানেক আগে হঠাৎই গান গাইবার ইচ্ছেটা চাগাড় দিয়ে উঠেছিল। খাটের নীচে থেকে ধুলো ঘেঁটে মায়ের হারমোনিয়ামটা বের করেছিলাম। ডজন খানেক আরশোলা বেরোল পরিষ্কার-টরিষ্কার করে।

যখন সাধক-সাধক মুখ এবং মন নিয়ে হারমোনিয়ামটা নিয়ে গলা সাধার জন্য সা রে গা মা পা ধা নি সা গাইলাম তখন দেখলাম হারমোনিয়াম বলছে অন্য কথা। সে বলছে, সা রে গা মা ফু ধা নি সা।

অর্থাৎ হারমোনিয়ামের 'পা' রিডটা কোনও কারণে না-বেজে শুধু ফুৎকার বার করছে। আর ওই বারংবার ফু-ফুৎকারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে সেই যে হারমোনিয়ামটাকে আবার খাটের নীচে ঢুকিয়ে দিলাম, তার পর থেকে তাকে আর বার করার ইচ্ছে হয়নি। ভেবেছিলাম লোক ডেকে সারাব। আজ-কাল করতে-করতে সেটা আজও হয়ে ওঠেনি।

আমার বাসস্থানটা একটু নির্জন জায়গায়, কলকাতার খুব কাছেই, নিউটাউন ছাড়িয়ে। একটা অসম্পূর্ণ কলোনিই বলা চলে।

প্রত্যেকটা ব্লকে আটটা করে কটেজ। পাশাপাশি চারটে, আবার সামনে রাস্তার উলটো দিকে চারটে। আটটার মধ্যে চারটেতে লোক আছে। বাকি চারটে চারজন এন.আর.আই.-দের। তাঁরা কবে আসবেন কেউ জানে না।

জায়গাটা নির্জন হলেও আমার খুব একটা অসুবিধে হয় না। কারণ আমার কোনও বন্ধুবান্ধব নেই, আমি কারোর সঙ্গে মিশিই না। অফিসের কথা আলাদা। সেখানে কথা বলতেই হয়। তা ছাড়া আমি কারও সঙ্গে কথা বলি না। আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লকের কারও সঙ্গে তো নয়ই।

লোকজন তাতে যে কিছু ভাবে, সে অবকাশও নেই। কারণ এই আট কটেজের পাড়ায় দুজন বাসিন্দা—বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। আর কোণের কটেজে থাকে দাশগুপ্ত দম্পতি। আমি সবারই নাম জানি, কিন্তু মিশি না।

দু-বছর আগে আমার স্ত্রী মারা যায়। তারপর থেকে তো খুব একটা অফিসেও যাই না। নেহাত ওটা আমার-ই ফার্ম তাই...।

এমনিতেই আমার মানুষজন খুব একটা পছন্দ নয়। আর এখানকার মানুষজনকে তো আমার বিরক্তিকর লাগে। ডাস্টবিন থাকা সত্ত্বেও রাস্তায় ময়লা ফেলে, বাগান পরিষ্কার করে না, গ্যারেজ থাকা সত্ত্বেও রাস্তায় গাড়ি রাখে।

অসহ্য! বুড়োদের তবু মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু দাশগুপ্তদের দেমাক দেখলে গা জ্বালা করে। বিরক্তিকর একটা দম্পতি! মহিলা প্রচণ্ড অহংকারী। নিশ্চয়ই বড় চাকরি করে, বরটাকে যেন মানুষ-ই মনে করে না। বর কেন, পৃথিবীর কাউকেই যেন মানুষ মনে করে না।

আর বরটাও কেমন যেন, ভিজে বেড়ালের মতো। আমার মনে হয় মিচকে শয়তান। কখনও-সখনও আমার মুখোমুখি হলে আমি মুখ ঘুরিয়ে নিই। তাতে আমায় কেউ অভদ্র ভাবলে আমার বয়েই গেছে।

এই তো দিন সাতেক আগে আমি ফিরছিলাম গাড়িটা নিয়ে। আমাদের কটেজে ঢোকার রাস্তাটা ঘোরার ফলে একটু সরু হয়ে ছিল। দুটো গাড়ি পাশাপাশি যায় না। আমি ঢুকতে গিয়ে দেখি, দাশগুপ্তর গাড়ি উলটো দিকে। আমি তখন আমার চার নম্বর কটেজের প্রায় দোরগোড়ায়। ওরা থাকে একনম্বর কটেজে। ওর-ই গাড়িটা পেছিয়ে নেওয়ার কথা। কিন্তু গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আধঘণ্টা পার হয়ে গেল। ও হর্ন দিল, আমিও দিলাম। তারপর আরও আধ ঘণ্টা চলল হর্নের যুগলবন্দি। একসময় আমি নেমে রাস্তাতেই গাড়ি রেখে দিয়ে হেঁটেই বাড়িতে ঢুকে পড়লাম।

দু-ঘণ্টা পরে উঁকি মেরে দেখেছিলাম, ব্যাটা দাশগুপ্তর গাড়িটা আর ওখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল না। নিশ্চয়ই আবার গ্যারেজে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তারপর হেঁটে বা ওলা ডেকে বাইরে যেতে হয়েছিল। ব্যাটাকে টাইট দিয়ে বেশ মজাই লেগেছিল।

'ঠাকুর সাহাব, ইয়ে দোনো খোটা সিক্কা হ্যায়।'

'ইনসান ঔর সিক্কে মে এহি ফরক হ্যায়!'

এরপরেই কমার্শিয়াল ব্রেক। এই ফাঁকে খাবারটা খেয়ে নেব বলে হাত বাড়িয়েছি, এসময় ফোনটা বেজে উঠল।

না, সেলফোন নয়। ইন্টারকম। এমনি হয় না, ওমনি! নটে শাকের আবার ক্যাশমেমো! এই আটটা কটেজে পারস্পরিক কথাবার্তার জন্য ইন্টারকম, একটা সিকিউরিটি গার্ডের গুমটিও আছে। কিন্তু গার্ড নেই। হয়তো এলাকাটা জমজমাট হয়ে ওঠার অপেক্ষায় এসব করা হয়েছিল।

ইন্টারকমে ফোন মানে তো আবাসিকদের কেউ! জ্বালাতন। বিরক্তি নিয়ে ফোনটা ধরলাম, 'হ্যালো।'

ওপাশ থেকে দ্বিধাজড়ানো গলা, 'আমি দাশগুপ্ত বলছি।'

'কী ব্যাপার?'

ওপাশে হতাশ কণ্ঠস্বর, 'অবশেষে দিনটা এসেই গেল। কোনওভাবে আটকানো গেল না!'

বললাম, 'দিন আটকে থাকে ক্যালেন্ডারের পাতায়। এ ছাড়া দিন আটকানো যায় নাকি?'

ওপাশ থেকে দীর্ঘশ্বাস, 'রসিকতা করছেন! তা ভালো। কিন্তু ভাবতে পারছেন না আমার এখন কী অবস্থা!'

'কী অবস্থা?'

'একপাল কাপড়জামা কাচতে বসেছিলাম। সারা গায়ে সাবানের ফেনা। আমার তো ওয়াশিং মেশিন নেই। ব্যাট পিটিয়েই কাপড় কাচছিলাম। পরনের হাফপ্যান্টটাও ভিজে ঢোল।'

'কাপড়-কাচা শেষ করুন। প্যান্টটা বদলে নিন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপাশ থেকে হতাশা—'আপনি তো বলেই খালাস। একা একা আমার পক্ষে কি সম্ভব?'

আমি বিরক্ত, 'আপনার স্ত্রীকে বলুন সাহায্য করতে।'

দাশগুপ্ত বলে, 'তবেই হয়েছে! ও করবে আমার কাজ! এই তো দেখুন না ড্রইংরুমে কেতরে মরে পড়ে আছে। ঘরটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।'

'কী করে হল?'

ওপাশ থেকে গলা শোনা গেল, 'কাপড় কাচার ব্যাটটা মাথায় লাগল...পড়ে গেল...মরে গেল...'

'ব্যাটটা লাগল কী করে?'

ওপাশ থেকে বলল, 'আমিই চালালাম। এখন রক্তে ঘর ভাসছে।'

চট করে ঘড়িটা দেখে নিয়ে বললাম, 'ঘণ্টা খানেক চুপ করে বসে থাকুন। পারলে খেয়ে নিন। এরপর খাবার সময় পাবেন না। আমি আসছি।'

ফোনটা রেখে দিয়ে টেবিলে রাখা খাবারদাবার আবার ফ্রিজে রেখে দিলাম। খাবার ইচ্ছেটা চলে গেছে। টিভিতে এখন সুর্মা ভূপালী...আমি সোফায় বসে দেখতে শুরু করলাম।

এক ঘণ্টা পরে বাড়ির সব আলো নিভিয়ে পেছন-দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দাশগুপ্তর কটেজের পিছন দিকের উদ্দেশ্যে।

নক করতে হল না। দেখলাম, বাগান-সংলগ্ন গেটটার দরজায় দাশগুপ্ত দাঁড়িয়ে। ভিজে হাফপ্যান্টটা ছেড়ে একটা ফুল প্যান্ট আর ঢোলা একটা গেঞ্জি পরেছে। দেখতে গোলগাল। বয়েস আমারই মতো। চল্লিশ হবে।

আমরা ড্রইংরুমের সোফায় বসলাম। সামনেই পড়ে আছে মিসেস দাশগুপ্তর মৃতদেহ। দাশগুপ্ত বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'একটু কফি করি?'

আমি মৃতদেহটা দেখতে দেখতে মাথা নাড়লাম। বললাম, 'রক্তটা মোছা দরকার। দুটো পুরোনো সুতির শাড়ি আনুন।'

দাশগুপ্ত ঘাড় নেড়ে ঘরের ভেতর চলে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি গোটা ঘরটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। দাশগুপ্তর অবস্থা ভালোই। বউ ভালোই রোজগার করত। আর শুনেছি দাশগুপ্ত নাকি একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার।

দাশগুপ্ত সুতির শাড়ি নিয়ে এল। বললাম, 'একটা শাড়ি দিয়ে সব রক্ত মুছে নিতে হবে। আরেকটা দিয়ে ফাইনাল টাচ।'

কাজ শুরু হয়ে গেল-মেঝেতে আর রক্তের দাগ নেই। তবু আর একবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেঝেটা দেখলাম। তারপর বললাম, 'কেরোসিন।'

দাশগুপ্ত একটা বোতল নিয়ে এল। এবার কেরোসিন দিয়ে আরও একপ্রস্থ ঘর মোছা হল। বললাম, 'ব্যাটটা কোথায়?'

দাশগুপ্ত বলল, 'ধুয়ে রেখে দিয়েছি।'

বললাম, 'ওটা নিয়ে আসুন। আর-একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটও আনুন।'

দাশগুপ্ত সব নিয়ে এল। আমি ব্যাট ও শাড়ি দুটোকে ব্যাগটার মধ্যে ঢুকিয়ে নিলাম।

এরমধ্যে দাশগুপ্তকে বললাম, বউ-এর অফিসে একটা ফোন করতে, বউ এখনও ফেরেনি কেন তা জানতে।

এর আগেই আমি মিসেস দাশগুপ্তর ফোনটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। ব্যাটারি খুলে নিয়ে। এবার দুজনে মুখোমুখি বসলাম। বললাম, 'খেয়েছেন?'

দাশগুপ্ত বলে, 'হ্যাঁ। আপনি খেয়েছেন?'

বললাম, 'না।'

দাশগুপ্ত লজ্জায় লাল হয়ে বলে, 'একটু খেয়ে নিন না! ইলিশ মাছের ঝোল-ভাত...ও হো, আপনার তো আবার কাঁটাওয়ালা মাছ চলে না! শুধু ঝোল দিয়ে খেয়ে নিন, আমি একটা ডিম ভেজে দিচ্ছি।'

আমি সম্মতি জানালাম। বললাম, 'টিভিটা চালিয়ে দিন।'

টিভি চালু হল। গববর সিং, 'কিতনে আদমী থে?'

মুগ্দ হয়ে দেখছিলাম। দাশগুপ্ত খাবারের প্লেটটা এনে হাতে দিয়ে বলে, 'সত্যি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারে মাস্টার পিস! এ ছবি আর হবে না।'

বললাম, 'জানেন, সত্যজিৎ রায়ও রমেশ সিপ্পিকে প্রশংসা করে বলেছিলেন, আমায় শোলে বানাতে বললে আমি বানাতে পারতাম না।'

দাশগুপ্ত সোফায় বসে ছবি দেখতে থাকে। আমি খেতে-খেতে। গববর সিং হাসছে...হাসতে হাসতে গুলি চালায়...নৈঃশব্দ্য ছড়িয়ে পড়ে। আমি টিভি মিউট করে বলি, 'কিন্তু হঠাৎ ব্যাটটা চালালেন কেন?'

দাশগুপ্ত হতাশ গলায় বলে, 'আরে, আমি কাপড় কাচছিলাম। ঘ্যাং ঘ্যাং করে ভীষণ বেল বাজাচ্ছিল। আমি শুনতে পাইনি। তারপর যখন এসে খুললাম, আমায় বসিয়ে দিল এক চড়। গেল মাথাটা গরম হয়ে। দিলাম বসিয়ে ব্যাটটা মাথায়।'

আমি বললাম, 'এইটুকু কারণে ব্যাট চালিয়ে দিলেন! একটা চড় খেয়ে? এর আগে যেন মার খাননি, এমন ভাব করছেন।'

দাশগুপ্ত বলে, 'খেয়েছি। কিন্তু আজ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। কেন যে এমন হল, বুঝতে পারছি না। এখন একটু অপরাধবোধও জাগছে।'

টিভির সাউন্ড অন করে বললাম, 'হুঃ! আর অপরাধবোধ জাগাতে হবে না! দেখুন গববর সিং কেমন জাগছে!'

টিভিতে ভেসে এল, 'হোলি কব হ্যায়, কব হ্যায় হোলি?'

একটু পরে বললাম, 'ইনহেলারটা নিয়েছেন?'

দাশগুপ্ত একটু চমকে বলল, 'এ মা, একদম মনে ছিল না।'

আমি বললাম, 'নিয়ে নিন। নইলে একটু পরেই তো জিভ বার করে হাঁপাতে শুরু করবেন।'

দাশগুপ্ত তাড়াতাড়ি ভেতরের ঘরে ঢুকে পড়ে। একটু পরে ইনহেলারটা হাতে নিয়ে সোফায় বসে পড়ে, 'নিয়েছি। উত্তেজনায় ভুলেই গেছিলাম যে আমি একজন হেঁপো রুগি।'

এবার টিভির পর্দায় গান ভেসে ওঠে। হোলির গান। একঝলক এ. কে. হাঙ্গলকে দেখায়। ছবিতে যিনি ইমামসাহেবের রোল করেছিলেন। টিভি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিউট করে দাশগুপ্তকে বলি, 'বলুন তো শোলে ছবিতে ইমামসাহেবের শালার নাম কী?'

দাশগুপ্ত বলে, 'ছবিতে ওরকম কোনও চরিত্রই নেই।'

বললাম, 'চরিত্র নেই। কিন্তু রেফারেন্স আছে।'

দাশগুপ্ত কিছুক্ষণ ভেবে মাথা চুলকে বলে, 'বলতে পারছি না মশাই।'

আমি হেসে বললাম, 'মুকইতুল্লা।'

দাশগুপ্ত বলেন, 'যাঃ! এ তো বানিয়ে বলছেন মশাই।'

আমি বললাম, 'মোটেই না। পোস্টম্যান যখন চিঠি নিয়ে আসে এবং অন্ধ ইমাম পোস্টম্যানকেই যখন চিঠিটা পড়ে দিতে বলেন, তখন সে চিঠির নীচে স্বাক্ষর হিসেবে পড়ে—মুকইতুল্লা...।'

দাশগুপ্ত বড় বড় চোখ করে বলে, 'আপনি তো জিনিয়াস মশাই!'

এবার ঘড়ি দেখে বলি, 'এবার তো উঠতে হবে। আপনার স্ত্রীর গাড়িটা কোথায়? গ্যারেজে তো?'

সে বলে, 'হ্যাঁ, গ্যারেজে গাড়িটা ঢুকিয়ে...তারপরই বারবার বেল বাজাচ্ছিল?'

আমি বললাম, 'বাড়ির ভেতর থেকে গ্যারেজে যাওয়ার দরজাটা খুলুন—'

দাশগুপ্ত তা-ই করল। আমি গ্যারেজটায় ঢুকলাম। সাদা রং-এর একটা অলটো আর নীল রং-এর একটা সুইফট দাঁড়িয়ে। আমি জানি, সাদা রঙেরটাই মিসেস দাশগুপ্তর গাড়ি।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দাশগুপ্তকে বললাম, 'বডিটা গাড়িতে তুলতে হবে। পা-দুটো ধরুন।'

একসময় বডিটা গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে পায়ের কাছে কুঁকড়ে রাখা হল। আবার ঘরটা ভালো করে পরিষ্কার করে আমরা গ্যারেজে এলাম।

দাশগুপ্তকে বললাম, 'এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট কেস হবে। উনি গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন, অফিস থেকে ফেরার পথে। এখন আপনি গাড়িটা চালিয়ে চলুন। আমি আমার গাড়ি নিয়ে আপনার পিছনে আসছি। চলুন, স্টার্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করুন।'

দাশগুপ্ত এবার একটু নার্ভাস গলায় বলল, 'কোনদিকে যাব? রেললাইনের দিকে?'

আমি বিরক্ত গলায় বলি, 'রেললাইন কেন? আপনার মাথায় কি আর কিছু ঢোকে না? চলুন, ব্রিজটা ধরব। একটা ঢালু জায়গা চাই।'

আমি আমার গাড়িটা চালাচ্ছি। সামনে দাশগুপ্তর গাড়ি। একটা জায়গায় এসে ডিপার করলাম। দাশগুপ্ত গাড়িটা থামাল, আমি তার পেছনে গাড়ি রেখে নেমে গেলাম। দাশগুপ্ত নেমে বলল, 'এখানে?'

আমি বললাম, 'ঢালু জায়গা তো কোথাও পাচ্ছি না। একটা বড় পাথর জোগাড় করুন।'

দাশগুপ্ত টর্চ জ্বালিয়ে খুঁজতে লাগল। এক সময় পাওয়া গেল। আমরা মিসেস দাশগুপ্তকে ড্রাইভিং সিটে বসিয়ে দিলাম। সিটবেল্ট-এর ক্লিপটা ভেঙে দিলাম। তারপর ব্রেকে পা দিয়ে গাড়ি স্টার্ট করে একসিলেটারের ওপর বিশাল ভারী পাথরটা বসিয়ে দিলাম। গাড়ির স্পিড প্রায় একশো! তখনি আমি লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেলাম, ব্রেক থেকে পা সরিয়ে দিয়ে।

রাস্তার ওপর ছিটকে পড়লাম হুমড়ি খেয়ে। গাড়িটা গিয়ে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা খেল সামনের চৌমাথার মোড়ে, এক দেশবরেণ্য মানুষের ব্রোঞ্জের মূর্তির সঙ্গে!

যা চেয়েছিলাম তাই হল। গাড়ি ছত্রখান।

এবার দৌড়ে গিয়ে একসিলেটারে রাখা পাথরটাকে বের করে নিজের গাড়িতে নিয়ে এলাম। বললাম, 'কুইক! এবার পালাতে হবে।'

গাড়ি স্টার্ট করে দিয়েছি।

দাশগুপ্ত ড্রাইভারের পাশের সিটে গা এলিয়ে পড়ে আছে। স্বাভাবিক। বেচারার কম ধকল গেল না।

আমি গাড়ি চালাচ্ছি। রাত আড়াইটে। ভাগ্যিস রাস্তায় কোনও লোক বা পুলিশের জিপ পাইনি! দাশগুপ্ত বলল, 'সব ঠিকই আছে, কী বলেন মশাই!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'একদম মাখ্‌খন! বাড়ি গিয়ে শোলের শেষ অংশটা দেখে ঘুমোন। কাল পুলিশ-আসা পর্যন্ত। মনে রাখবেন, শোলেই কিন্তু আপনার অ্যালিবাই।'

দাশগুপ্ত অবাক হয়ে বলে, 'কী করে?'

আমি বলি, 'আপনি বউয়ের মৃত্যুর সময়ে শোলে দেখছিলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, এটাই বলবেন পুলিশকে। এবার বলুন তো, অমিতাভ-র মৃত্যুর জন্য সরাসরি দায়ী কে?

দাশগুপ্ত বলে, 'গববর সিং।'

'না, গুলাব সিং। কাঠের ব্রিজের নীচ দিয়ে যে ঝুলে ঝুলে আসছিল...যাকে মারতে গিয়ে অমিতাভ, মানে জয়-এর শেষ গুলিটাও ফুরিয়ে গেছিল।'

দাশগুপ্ত বড় বড় চোখ করে শুনছে। আমি ফের বলি, 'শোলে ছবিতে একটা বড় প্রশ্ন থেকে গেছে। একটা অসংগতিও বলতে পারেন। ভেবে দেখুন রামগড় গ্রামের সবচেয়ে বড়লোক হচ্ছে ঠাকুর বলদেব সিং—অর্থাৎ সঞ্জীব কুমার। তাঁর বাড়িতেই ইলেকট্রিসিটি নেই। তার মানে সারা গ্রামেও ইলেকট্রিসিটি নেই। তাহলে জলের বিশাল ট্যাঙ্কটাতে জল ওঠে কী করে? যে জলের ট্যাঙ্কে উঠে বীরু মানে ধর্মেন্দ্র সুইসাইড করার অ্যাকটিং করছিল?'

দাশগুপ্ত বড়-বড় চোখে ঘাড় নাড়ে, 'হ্যাঁ তো!'

বললাম, 'বেশ। শোলে ছবিতে আরেকটাও ঘাপলা আছে। এই যে দেখেন সিনেমা শুরুর আগে প্রযোজক একটা ডিক্লারেশন দেয় যে, কোনও পশু এই ছবিতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়নি বা মৃত্যু হয়নি। এটা সিনেমাটোগ্রাফিকাল অ্যাক্ট-এর মধ্যে অ্যানিম্যাল রাইট ইত্যাদি ইত্যাদি জুড়ে দেওয়ার কারণে বলতে হয়। কিন্তু শোলে-তে সত্যি-সত্যিই একটা প্রাণীর মৃত্যু হয়েছিল। সবাই দেখেছে। কিন্তু কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। কে সেই প্রাণী?'

দাশগুপ্ত বিস্মিতভাবে ঠোঁট ওলটাল।

'যখন ইমাম সাহেবের ছেলে, আহমেদ শহরে যাচ্ছিল ঘোড়ায় চড়ে মামার কাছে চাকরি করতে, ডাকাতদের হাতে সে যখন ধরা পড়ে, তখন গববর সিং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাটের ওপর উবু হয়ে শুয়ে, হাতের ওপর বেয়ে একটা পিঁপড়ে দেখছিল। হঠাৎই সে পিঁপড়েটাকে টিপে মেরে দেয়। পিঁপড়েটার সত্যিই মৃত্যু হল!'

দাশগুপ্ত বলে, 'আরিববাস! আপনি তো ডেঞ্জারাস লোক মশাই!'

'হ্যাঁ। আপনি এগুলো মনে রাখুন—পুলিশের জেরায় কাজে আসবে।'

ফেরার পথে বিভিন্ন ডোবা, আবর্জনার স্তূপ, নানা জায়গায় আমরা ভাগে-ভাগে রক্তমাখা শাড়িদুটো আর ব্যাটটা ফেলে দিলাম। তারপর গাড়িটা নিয়ে নিঃশব্দে আমার গ্যারেজের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। গ্যারেজের সাটার টেনে দিলাম।

তারপর আমার বাড়ির বাগান টপকে দাশগুপ্ত তার বাড়ির পেছন দিয়ে নিজের বাড়িতে ঢুকে যায়। আমি আমার ড্রইংরুমে বসে একটা সিগারেট ধরাই। যাক, এবার নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যাবে।

সিগারেটটা সবে শেষ করেছি, আবার ইন্টারকমটা বেজে উঠল, 'আমি দাশগুপ্ত বলছি...'

'হ্যাঁ, বলুন। আবার কী হল?'

ওপাশ থেকে কাঁদো কাঁদো গলা, 'আমি ইনহেলারটা গাড়িতে ফেলে এসেছি!'

আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। হঠাৎ করে গলা শুকিয়ে আসতে লাগল। খালি বলতে পারলাম, 'ভাববেন না, আমি দেখছি। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।'

রাত সাড়ে তিনটে। আমি গাড়ি চালাচ্ছি, ভাঙা গাড়ি থেকে দাশগুপ্তর ইনহেলারটা উদ্ধার করার জন্য। এতক্ষণে যদি লোকজন জড়ো হয়ে যায় বা পুলিশ এসে গিয়ে থাকে, তা হলে তো হয়ে গেল! তবু একটা ক্ষীণ আশা, যদি জায়গাটা ফাঁকা থাকে!

আসলে দাশগুপ্তর জন্য এতটা করতে আমার ইচ্ছে করছে, একথা বলব না কিন্তু না-করে উপায়ও নেই। পার্টনার তো!

আজ থেকে দু-বছর আগে আমার স্ত্রীর বডিটাও যখন রেললাইনে ফেলে এসেছিলাম, তখন দাশগুপ্ত আমার আজকের ভূমিকাটাই নিয়েছিল। সেটা আমি ভুলি কেমন করে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুতরাং ওর জন্য এ-ঝুঁকিটুকু নিতেই হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

মরতে দম তক

'সপ্তাহে একদিন আমরা সবাই গাছ হয়ে যাই',—ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে লোকটা বলছিল।

আমরা তখন একটু তরল পদার্থ নিয়ে জঙ্গলের দিকে মুখ করে বাংলোটার সামনে বসেছিলাম। অন্ধকার বাড়ছে, ঝি ঝি পোকাদের ডাক সেকথা বুঝিয়ে দিচ্ছে। আমরা চারজন বন্ধু ছুটি কাটাতে এসেছি উত্তরাখণ্ডের পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা জিডং নামের এই জায়গাটায়।

জনবসতি নেই বললেই চলে। এই বাংলোটা ইংরেজ আমলে তৈরি। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটাই দেখাশুনো করে, নাম পাহাড় সিং। ওর বয়েস বোঝা মুশকিল। নিজেও বলতে পারল না। মুখে একটা অদ্ভুত সরল হাসি, আমাদের পানীয় থেকে ওকেও একটু ভাগ দেওয়া হয়েছিল—আমাদের মতো ওর চোখেও নিশ্চয়ই রঙিন ফানুস!

কথা হচ্ছিল জঙ্গলের গাছ নিয়ে। তখনই লোকটা বলে উঠল, 'সপ্তাহে একদিন আমরা সবাই গাছ হয়ে যাই।'

'আমরা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাই। হঠাৎ-ই অনিন্দ্য বলে উঠল, সপ্তাহে নয়, প্রতিদিনই আমরা সন্ধের পর মাছ হয়ে যাই।' বলেই হাতের গ্লাসটা দেখায়। আমরা সবাই হেসে উঠি। পাহাড় সিং আমাদের রসিকতাটা ধরতে পারে না, সে বোকার মতোই হাসে, আমাদের হাসিতে।

আমাদের মধ্যে সব থেকে গম্ভীর রাজা—সে এবার বলে, 'এ ব্যাটাকে নেশা না করালেই হত।

আমাদের কথার মানে লোকটা বুঝছিল না, কারণ আমরা বাংলায় কথা বলছিলাম। কিন্তু লোকটা প্রচুর আগ্রহ নিয়ে আমাদের কথা শুনছিল। আসলে এই জঙ্গলের মধ্যেই তো থাকে, মানুষজন খুব একটা দেখতে পায় না।'

আমি জিগ্যেস করলাম হিন্দিতে, 'তা পাহাড় সিং কখনও শহরে গেছ?'

লোকটা বলে, 'না বাবুজি, আমি জঙ্গল থেকে কখনো বেরোইনি। যাবার ইচ্ছেও নেই 'মরতে দম তক অর্থাৎ আমৃত্যু।'

রাজা বলল, 'একা একা এই জঙ্গলের মধ্যে থাকো কী করে?'

সে বলল, 'একা কোথায়? এত গাছ, এত পাখি, ওদের সঙ্গেই কথা বলে সময় কাটে।'

আমি বললাম, 'ওদের সঙ্গে কথা বলো?'

'লোকটা হেসে বলে, 'হাঁ বাবুজি, ওদের সবার নাম ভি আছে।'

অনিন্দ্য বলে, 'এ তো এ-যুগের বিভূতিভূষণ।'

আমরা হেসে উঠি। লোকটা বুঝতে পারে না, কারণ অবশ্যই ভাষা।

এবার আমাদের আরেক বন্ধু চন্দন বলে, 'তোমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটা বলে, 'আমরা দু-ভাই। একজন আছে অনেক দূরের জঙ্গলে, মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে, আরেকজন নেই—ওকে কেটে দিয়েছে।'

'কেটে দিয়েছে মানে?' বিস্ময় প্রকাশ করলাম আমি।

লোকটা অদ্ভুত ভাবে হাসে। বলে, 'ও যেদিন গাছ হয়েছিল, সেদিন জঙ্গলে ইজারাদাররা এসেছিল। অন্য গাছের সঙ্গে ওকেও কেটে নিয়ে চলে গেল।'

রাজা বলে, 'তোরা এটাকে থামা।'

আমি হাসতে হাসতে বলি, 'দাঁড়া না, নিখরচায় এত ভালো টাইম পাস এখানে আর পাবি?'

অনিন্দ্য এবার প্রশ্ন করে, তোমার বাবাও কি গাছ হতে পারে?'

লোকটা বলে, 'আমার বাবা গাছ হয়েই তো মারা গেছে, আর মানুষ হতে পারেনি।'

আমি বলি, 'কেন? তোমরা তো সপ্তাহে একদিন গাছ হও, তারপর তো আবার মানুষ!'

লোকটা বলে, 'আমার বাবা যেদিন গাছ হল, সেদিনই পাণ্ডবরা আমার বাবার কোটরে তাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো লুকিয়ে রেখে বিরাট রাজার মহলে চলে গেল, অজ্ঞাতবাসে।'

অনিন্দ্য চোখ বড় বড় করে বলে, 'পাণ্ডব মানে! মহাভারতের?'

লোকটা বলে, 'হাঁ বাবু।'

আমি অনিন্দ্যকে থামিয়ে দিয়ে বললাম 'বেশ, বেশ। তা এর সঙ্গে তোমার বাবার গাছ হয়ে মারা যাওয়ার সম্পর্ক কোথায়?'

লোকটা করুণ স্বরে বলে, 'অর্জুনজির অস্ত্রগুলোর মধ্যে ব্রহ্মাস্ত্রও ছিল। তার তো একটা বিষ আছে না! সেই বিষেই বাবা মরে গেল।'

রাজা বিড়বিড় করে বলে, 'নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন। পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা।'

লোকটা কিছু বুঝতে না পেরে রাজার দিকে সরল চোখে তাকায়। রাজা বলে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবার আমাদের জন্য মুরগি ভাজাগুলো নিয়ে এসো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটা খুশি মনে বাংলোর ভেতর চলে গেল।

অনিন্দ্য একটু পরে বলল, 'কী বলল শুনলি?'

আমি হেসে বলি, 'ভালোই তো লাগছে—মাইথোলজির সঙ্গে সায়েন্স ফিকশন।'

রাজা বিরক্ত হয়ে বলে, 'এই থাম তো, গুলবাজির একটা সীমা আছে।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম 'আমাদের এখানে তো কোনও কাজ নেই, একজন কল্পনাবিলাসী লোকের কথায় তোরা রি-অ্যাক্ট করছিস কেন? আমার তো মজাই লাগছে।'

এমন সময় লোকটা মুরগি ভাজা নিয়ে এল। সবাই একবাক্যে স্বীকার করল, লোকটার রান্নার হাতের জবাব নেই, সে যতই গুলবাজ হোক।

আমরা আবার নিজেদের মধ্যে বাংলায় কথাবার্তা শুরু করলাম। লোকটা উবু হয়ে বসে একটা টিনের মগে আমাদের দেওয়া পানীয়ে চোখ ডোবায়।

রাজা মুরগি চিবোতে চিবোতে লোকটার উদ্দেশ্যে বলে, 'রান্নার হাতটা এরকমই রেখো, তা তুমি যতই গাছ হও না কেন!'

লোকটার মুখে হাসি, চোখ দুটো চকচক করে উঠল। বলল, 'হাঁ বাবুসাহাব, মরতে দম তক।'

আমরা অন্ধকার জঙ্গল-ঘেঁষা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু একটু নেশা ধরেছে সবার। দূরে একটা রাতপাখি ডেকে উঠল। পাহাড় সিং কান খাড়া করে শুনল। বলল, 'টেপী।'

'কে টেপী?'—কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না আমি।

ও বলে, যে পাখিটা ডাকল, ওর নাম। ও বড় তকলিফে আছে—ওর মরদটা দুদিন ঘরে ফেরেনি।'

অনিন্দ্য হতাশভাবে আমার দিকে তাকাল। আমি হাত তুলে ওকে শান্ত হতে বলি। হঠাৎ-ই রাজা বলে, 'তা পাহাড় সিং তুমি তো গাছ হতে পারো। আমরা তো আরও দিন দুয়েক আছি—তা আমাদের একটু গাছ হয়ে দেখাও দেখি—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটা হাত কচলে বলল, না বাবুজি, আপনারা আসার দুদিন আগে আমি গাছ হয়েছিলাম, আবার গাছ হতে আরো, পাঁচ দিন লাগবে।'

রাজা আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'কী সেয়ানা দেখেছিস?'

আমি হেসে ফেললাম। লোকটা কিন্তু নির্বিকার। উবু হয়ে বসে হাতের মগে চুমুক দিচ্ছে। পাহাড়ের দিক থেকে একটা ঠান্ডা হাওয়া আমাদের ছুঁয়ে চলে গেল, গায়ের জ্যাকেট গুলোকে সতর্ক করে দিয়ে।

আমি পাহাড় সিংকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কী করে গাছ হও?'

পাহাড় সিং উত্তরে বলে, 'কেন? খুব সোজা। মাটিতে পা-দুটো ডুবিয়ে দু-হাত তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি—একটু একটু করে গাছ হয়ে যাই।'

আমি বললাম, 'বাঃ! এত সোজা?'

ও বলে, 'আপনারাও চেষ্টা করুন—দেখবেন, পারবেন।'

অনিন্দ্য রেগে গিয়ে বলে, 'মাজাকি হচ্ছে? হাত ছড়ালেই গাছ! একি ভাত ছড়ালেই কাকের মতো নাকি?'

লোকটা শান্ত গলায় বলে, 'হাঁ বাবু, আপনারাও পারবেন।

মাটিকে একটু ভালোবাসুন ভাবুন দুনিয়াকে কিছু দিতে হবে। মনের মধ্যে রাগ-ঘৃণা কিছু রাখবেন না। দেখবেন গাছ হয়ে গেছেন।'

রাজা বলে, 'এ তো ব্যাটা ফিলোজফি শেখাচ্ছে'?

আমি রাজাকে থামিয়ে দিয়ে পাহাড় সিংকে বলি, 'এভাবেই গাছ হয়ে যাওয়া যায়?'

'লোকটা সরল হাসি হেসে বলল, 'আলবাৎ। আমি বাজে কথা বলছি না। বলবও না। মরতে দম তক।'

অনিন্দ্য এবার বলে, 'গাছ হয়ে কী করো?'

লোকটা মগে চুমুক দিয়ে বলে, 'আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি— জঙ্গলের গন্ধ নিই, কথা বলি। দুনিয়ার বিষ নিই, আর তাজা হাওয়া দুনিয়াকে দিই—।'

রাজা বিড়বিড় করে, ফোটোসিন্থেসিস, সালোকসংশ্লেষ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ওকে থামিয়ে বলি, 'কথা বলো কাদের সঙ্গে?'

লোকটা বলে, 'জঙ্গলে যা যা আছে সবার সঙ্গে।' তারপর লোকটা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, ওই আকাশের ওপারেও গাছ আছে,-ওদের সঙ্গেও কথা হয়। ওরা অনেক কিছু বলে দেয়। আমাদের বংশ ছাড়াও অনেকে ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারে, এই দুনিয়াতেই অনেক লোক আপনাদের মতো।'

আমি প্রশ্ন করি, 'আমাদের মতো লোক, মানে যারা গাছ হতে পারি না?'

ও বলে, 'হাঁ বাবুজি, ওরাই, মানে ওপারের গাছেরাই, কে যেন টেসলা বলে একজন আছে...'

অনিন্দ্য সোজা হয়ে বসে, 'কোন টেসলা? জিনিয়াস সাইন্টিস্ট নিকোলা টেসলা?'

লোকটা হেসে বলে, 'আমি বাবু আনপড় লোক। আমি কী করে জানব! আকাশের ওপারের গাছেরা এই নামটা বলেছিল, তাই আপনাদের বললাম।'

রাজা এবার গম্ভীর হয়ে বলে, 'তুমি আর একটু মুরগি নিয়ে এসো তো।'

লোকটা ভেতরে যাওয়ার পর রাজা নীচু গলায় বলে, 'এই গেঁয়ো ভূতটা টেসলার নাম জানল কী করে?'

আমি বললাম, 'আমাদের মতো কোনও ট্যুরিস্টের কাছেই হয়তো শুনেছে, তারপর তাতে নিজের রং চড়াচ্ছে।'

রাজা সিরিয়াস হয়ে বলে, 'না, না, তোরা বুঝতে পারছিস না—ও এলিয়ন তত্ত্বের কথা বলছে। নিকোলা টেসলা নিজে বলতেন, যে তাঁর অভিনব সব আবিষ্কারের আইডিয়াগুলো নাকি এলিয়নরা দিয়েছে।

চন্দন ফুটবলার। আমাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম পড়াশুনো করেছে, ওই জিজ্ঞাসা করল, 'এই টেসলা, এলিয়ন এসব কী?'

আমি বললাম, এলিয়ন মানে অন্যগ্রহের জীব। একদল মানুষের ধারণা যে, তারা আমাদের থেকে লক্ষগুণ বেশি শিক্ষিত এবং উন্নত, পৃথিবীর সভ্যতার অগ্রগতিতে তাদের অনেক অবদান হয়তো আছে। আর নিকোলা টেসলা হলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন বিজ্ঞানী, এক কথায়, বহুমুখী প্রতিভাধর। তাঁর প্রচুর আবিষ্কার আছে, যা পৃথিবীটাকে বহুগুণ উন্নত করেছে। টেসলাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, তাকে বহু আবিষ্কারের পদ্ধতি এবং আইডিয়া নাকিএলিয়নরা দিয়েছে, বুঝলি?'

AMARBOI.COM

চন্দন বলে, 'বুঝলাম। কিন্তু এর সঙ্গে গাছের সম্পর্ক কী?'

রাজা বলল, 'পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন প্রজাতি হল গাছ। পৃথিবীর গোটা ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের একমাত্র সাক্ষী। মানুষ যা জানে না, গাছ তা জানে। একদল বিজ্ঞানী বলছেন, পৃথিবীর বয়েস ৪০০ কোটি বছর আর প্রাণের ডি.এন.এ. টেস্ট করে দেখা গেছে—তার বয়েস ১০০০ কোটি বছর। তাহলে পৃথিবী সৃষ্টি হবার ৬০০ কোটি বছর আগে প্রাণ কোথা থেকে এল? তা হলে কি প্রাণ এসেছে অন্যগ্রহ থেকে? আর সেক্ষেত্রে এই গ্রহে প্রথম প্রাণ তো গাছ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। থেমে গেল, কারণ মুরগি ভাজা এসে গেছে। আমরা মুরগির দিকে হাত বাড়ালাম। পাহাড় সিং উবু হয়ে বসল, চন্দন লোকটাকে আর একটু পানীয় দেবার জন্য মগটা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'কী হে সাপ্তাহিক গাছ, এই পানীয় কেমন লাগছে?'

লোকটা অকপট হাসি মুখে বলে, 'এই জঙ্গলে এসব কোথায় পাব?' মজা আ গয়া,—ভুলেঙ্গে নাহি মরতে দম তক...'

রাজা গম্ভীর হয়ে বলে, 'গাছ হও কেন? মানে গাছ হয়ে কী লাভ?'

লোকটা মগে চুমুক দিয়ে বলে, 'দুনিয়ার হালাত খুব খারাপ—গাছ তো আর থাকছে না, মানুষ কেটে নিচ্ছে—এখন সব মানুষ যদি সপ্তাহে এক-একটা দিন গাছ না লাগায়, তাহলে দুনিয়া খতম হয়ে যাবে। এ সবই আকাশের ওপারের গাছেরা বলে বাবুজি।'

চন্দন বলে, 'অনেক হয়েছে টেনিদা, এবার থামো।'

রাত আরো বাড়তে আমরা ডিনার করে শুয়ে পড়লাম। পরের দুটো দিন জঙ্গলের ছবি তুলে কাটল। এবার আমাদের ফিরে যাওয়ার পালা। পাহাড় সিংকে বকশিশ দিতে গেলাম। সে নিল না—বলল, 'সে এই ক'টা দিন কখনও ভুলবে না। মরতে দম তক।

আমার মনে হল, 'মরতে দম তক' বলাটা এই লোকটার মুদ্রাদোষ, সব কথায় এটা সে ঠিক জুড়ে দেয়। আমরা ওকে কথা দিলাম, আমরা আবার আসব। লোকটাও ছলছল চোখে আমাদের বলল, সে-ও অপেক্ষা করে থাকবে, মরতে দম তক।

আমরা রওনা দিলাম কলকাতা অভিমুখে।

কেটে গেছে প্রায় পাঁচ-সাত বছর। বন্ধুদের সঙ্গে প্রায় দেখাই হয় না। আমার গাইয়ে হিসেবে একটু নাম ডাক হয়েছে, বিয়ে করেছি, এক বছরের বাচ্চাও আছে।

রাজাবাজারে একটা পুরোনো বাড়ি ভেঙে একটা ফ্ল্যাটে বাড়ি তৈরি হচ্ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা ফ্ল্যাট কিনে নিয়েছি। সাতদিন আগে গৃহপ্রবেশ করে। ফ্ল্যাটে থাকতে শুরু করেছি।

কিন্তু দেশ তথা রাজ্যের পরিস্থিতি খুব গোলমেলে—ধর্মের রাজনীতি দেশটায় জাঁকিয়ে বসেছে। সাধারণ মানুষ বড় উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে—এই বুঝি দাঙ্গা লাগল।

অবশেষে সেই দিনটা এল। সেদিন সকাল থেকে দেশ জুড়ে তোলপাড় দাঙ্গা বেঁধে গেছে। শুরু হয়ে গেছে লুঠ-পাট রক্তের বন্যা। সকাল থেকেই শহরে কার্ফু। সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের নাম নিচ্ছে ঘরে বসে। কখন দাঙ্গাবাজরা আক্রমণ করে এই আশঙ্কায় মানুষ দম নিতে ভুলে গেছে।

রাত বারোটার পরে ওরা এল। সমবেত চিৎকার ও মানুষের ভয়ার্ত আর্তনাদে ঘুম ভেঙে গেল। বুঝলাম ওরা আমাদের ফ্ল্যাটবাড়িটা ঘিরে ফেলেছে। একটার পর একটা ফ্ল্যাটে ঢুকে লুঠতরাজ, খুন শুরু করে দিয়েছে। আমার ফ্ল্যাটটা চারতলায়। ওরা উঠে আসছে—এদের কোনো ধর্ম নেই, এরা ঘাতক এবং পরিস্থিতির সুযোগটা নিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে খুন করে, লুঠ করে।

আমি পাগলের মতো ফোন করছি থানায়, সব নেটওয়ার্ক ব্যস্ত। নীচে প্রতিবেশীদের চিৎকারে কান ফেটে যাচ্ছে, পায়ের শব্দ উঠে আসছে ওপরে। ওরা এবার আমার দরজায় আঘাত করল। দরজা ভেতর থেকে লক। দরজাটার ওপর শক্ত কিছু দিয়ে ক্রমাগত আঘাতের শব্দ শুনছি। আমার স্ত্রী ভয়ে কাঁদছে, বাচ্চাটা চিল-চিৎকার করছে। দরজার ওপাশে অকথ্য গালিগালাজের কোরাস।

ওরা দরজা ভাঙার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পারছে না। এক সময় ওরা পেট্রল দিয়ে দরজা ভিজিয়ে দিল। তারপর আগুন লাগিয়ে দিল। ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেল—বাচ্চাটা কাশতে শুরু করেছে। আমি এবার বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বললাম, 'এ জন্মে আর বোধহয় দেখা হবে না। পরের জীবনে নিশ্চয়ই ভালো বাবা হব। দেখিস।'

একথা শুনে আমার স্ত্রী ডুকরে কেঁদে উঠল। হঠাৎ-ই বাড়ির নীচে ট্রাক থামার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আওয়াজ পেলাম। জানলার কাছে দৌড়ে গিয়ে দেখি দু-ট্রাক মিলিটারি দ্রুতগতিতে বাড়িটাকে ঘিরছে। দরজার ও-প্রান্তে এবার অন্য তৎপরতা—দাঙ্গাবাজরা পালাচ্ছে। নীচে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এতক্ষণে খেয়াল হল, দরজাটা দাউ দাউ করে জ্বলছে! গোটা বাড়িটায় আগুন লেগে যাবে...।

আমি আর আমার স্ত্রী দুজনেই বাথরুম থেকে বালতি করে জল ভরে দরজায় ঢালতে শুরু করলাম। এক সময় আগুন নিভল। সারা ঘর জলে থই থই করছে। মিলিটারি তখন বাড়িটা দখল করে নিয়েছে।

আমার স্ত্রী তখনও কাঁদছে, প্রাণ ফিরে পাওয়ার আনন্দে। নীচে কী হচ্ছে দেখার জন্য দরজাটার দিকে পা বাড়ালাম। দরজাটা একটা কালো প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে, যার সারা গা দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

দরজাটাকে ছুঁলাম। বালির বাঁধের মতো ঝুরঝুর করে দরজাটা ভেঙে পড়ল। পড়ার আগে বলল, 'বহুত কোশিশ কিয়া বাবুজি, মরতে দম তক।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

বনির জন্য

পালাবার আর পথ নেই বনির।

বনি, মানে বাণীব্রত রায়। খুব একটা বিখ্যাত লোক নয়। মোটামুটি বলতে গেলে সে একজন লো-প্রোফাইলেরই মানুষ। সমস্যা সেখানে ছিল না, সমস্যা অন্য জায়গায়। তার বউ, দময়ন্তী রায় মোটেই লো-প্রোফাইলের মানুষ নয়, একজন ডাকসাইটে এম এল এ। তাও আবার রুলিং পার্টির। কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছিল, খুব শিগগির উনি মন্ত্রী হতে চলেছেন। যে-সে মন্ত্রী নয়, তথ্য-সংস্কৃতি মন্ত্রী। রোজ খবরের কাগজ খুললেই ওঁর ছবি, প্রচুর জনপ্রিয়তা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখান থেকে দেখতে গেলে বনি অর্থাৎ বাণীব্রত সেরকম কিছুই নয়, সেলট্যাক্সের একজন সাধারণ কর্মচারী। মাইনে তেমন কিছুই নয়, উন্নতির তেমন কোনও সুযোগ নেই। আর সত্যি বলতে বনির খুব একটা উচ্চাকাঙ্খাও নেই। অন্তত লোকে তাই বলে। অলস বা কুঁড়ে হিসেবে তাকে নানা লোকের কথা শুনতে হয়। মূলত স্ত্রী দময়ন্তীর কাছ থেকে।

বনির এসব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও ইচ্ছেও দেখা যায় নি। অবশ্য লোকের ধারণা কিন্তু অন্যরকম। বনির কি সবটাই গা সওয়া হয়ে গেছিল, না কি ওর মতলব অন্য কিছু ছিল?

এখন লোকে তাই ভাববে। কারণ, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে সে দ্যাখে বিছানায় তার পাশে স্ত্রী দময়ন্তী শুয়ে আছে। বনির মাথা কাজ করছিল না। সারা বিছানা রক্তাক্ত। সে উঠে বাথরুমে যায়, মুখে চোখে জল দেয়। মনে হল, কাল রাতে সে একটু বেশিই ঘুমিয়েছে। তা হলে কি খাবার জলে কেউ কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল!

সে বাথরুম থেকে বেরিয়ে বাড়ির মূল দরজাটা দেখল ভালো করে, ভেতর থেকেই বন্ধ। তা হলে কেউ বারান্দা দিয়ে এসেছিল? কিন্তু তাই বা কী করে হয়! বারান্দা তো গ্রিল দিয়ে আটকানো। তা হলে কি কারুর কাছে ডুপ্লিকেট চাবি ছিল?

সময় পার হয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই কাজের মাসি এসে পড়বে, পার্টির লোকদের ভিড় শুরু হবে। কে বিশ্বাস করবে যে, সে নির্দোষ? দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। গোটা ফ্ল্যাটে সে আর দময়ন্তীর মৃতদেহ ছাড়া আর কেউ নেই। তারপর সবাই জানে তার আর দময়ন্তীর সম্পর্ক ভালো ছিল না, দময়ন্তী কথায় কথায় সবার সামনে বনিকে অপমান করত। লোকে তো দেখেছে।

এবার দেখবে দময়ন্তীর মৃতদেহ। ব্যস, দুয়ে দুয়ে চার বানিয়ে ফেলবে। বনির মাথার মধ্যে কে যেন বলে উঠল, 'পালাও'। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পড়তে পড়তে সে হিসেব করে, বাড়িতে কত টাকা তার আছে। হাজার তিনেক ক্যাশ। ড্রয়ার খুলে মানিব্যাগ বার করতে গিয়ে হাতে যেটা উঠে এল, তাতে তার দমবন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়ার উপক্রম হল। একটা রক্তমাখা ভোজালি। নিশ্চয়ই সে-রক্ত দময়ন্তীর।

নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করল। সে নিজেই মাথা বাড়িয়ে বলির পাঁঠা হয়েছে। রক্তাক্ত ভোজালিতে নিজের হাতের ছাপ দিয়ে ফেলেছে।

সে ভোজালিটা খাটের নীচে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তারপর মানিব্যাগটা নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। রাস্তায় কেউ ছিল না। পার্টির লোকেদেরও আনাগোনা শুরু হয়নি। সে একটা ট্যাক্সি ধরে, বলে, ধর্মতলা। ট্যাক্সির জানালাগুলো তুলে দেয়। কারণ এটা জানুয়ারি মাস। সকালটা বেশ ঠান্ডা। কিন্তু সে ঘামছে।

মাথার মধ্যে নানান হিজিবিজি, যা কোনওভাবেই কোনও নির্দিষ্ট ছবি দিয়ে উঠতে পারছে না। তার এত বড় সর্বনাশ কে করল, সে বুঝেই উঠতে পারছে না। তার তো কোনও শত্রু নেই। শত্রু থাকার যোগ্যতাই নেই তার। তাকে এভাবে কে ফাঁসালো!

গলা শুকিয়ে আসে বনির। সে একটা বড় দোকানের সামনে ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়ে এক বোতল জল কিনতে নামে। দোকানদার একটা বোতল এনে তার হাতে দেয়, তারপর খুচরো পয়সার জন্য দেরাজ খোলে। এবার বনির চোখ গেল দোকানে রাখা টিভি সেটটার দিকে। সেটার সাউন্ড মিউট করা। স্ক্রিন জুড়ে দময়ন্তীর ছবি। নীচে লেখা যাচ্ছে 'স্বামী পলাতক'। তারপর স্ক্রিন জুড়ে বনির একটা ছবি।

বনি আর দাঁড়ায় না। দৌড়ে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে। ট্যাক্সি চলতে থাকে। তারপর সারাটা দিন যে কীভাবে কেটেছে! তার সব জট পাকিয়ে আছে। রাত ন'টা অবধি সে শুধু ঘুরে বেড়িয়েছে। কখনো ট্যাক্সিতে, কখনো হেঁটে। বুদ্ধি করে একটা মাংকি টুপি কিনে নিয়ে ছিল, তাই কেউ তাকে চিনতে পারেনি।

সারাদিনে মাত্র দুটো কলা খেয়েছে। আর সারাদিন ধরে সে ভেবেছে, তার স্ত্রী দময়ন্তীর নিশ্চয়ই কোনও শত্রু ছিল। পলিটিক্যাল লোকেদের বন্ধু তো কমই হয়। সব ধান্দাবাজ। তাদেরই কেউ একটা হয়তো...

বিপদে পড়লে সব মানুষেরই যেমন মায়ের কথা মনে পড়ে, বনির পড়ল। ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা জলপাইগুড়িতে আছেন। একাই থাকেন। দময়ন্তী ওর মাকে দেখতে পারত না। বনিকেও যোগাযোগ করতে দিত না। অনেক অভিমান নিয়ে ভদ্রমহিলা জলপাইগুড়িতেই একা থাকেন।

আজ বনি ভেবে নিয়েছে, সে মায়ের কাছেই যাবে। মায়ের অনেক বুদ্ধি। মা নিশ্চয়ই কিছু একটা উপায় বাতলাতে পারবেন।

শিয়ালদহ স্টেশন। দার্জিলিং মেল। বনি উঠে বসেছে। রিজার্ভেশন নেই। ঠেসাঠেসি করেই জেনারেল কম্পার্টমেন্টে বসে আছে। ট্রেন চলেছে। আশেপাশে সবাই বসে বসেই ঘুমোচ্ছে, কিন্তু বনির চোখে ঘুম নেই। হঠাৎ-ই একটা স্টেশানে ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল। স্টেশনে ভারী বুটের শব্দ—পুলিশ! বনির হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। নিজের নির্বুদ্ধিতায় তার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল। সে পাবলিক বুথ থেকে মাকে ফোন করছিল। সে আসছে জানাবে বলে। মায়ের ফোন নিশ্চয়ই ট্যাপ হয়েছিল।

পুলিশ প্রত্যেক কামরায় তল্লাশি করছে। বনি উঠে পড়ে। ট্রেনের বাইরে উঁকি মারে। পুলিশ গিজগিজ করছে, সে পরের কামরায় চলে যায়। এটাই শেষ কামরা। এরপর আর পেছোনোর জায়গা নেই। পুলিশ এখন দু-তিনটে আগের কামরায়।

বনির গা ঘামে ভিজে জবজব করছে। হৃদপিণ্ডটা মনে হচ্ছে এবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। পুলিশ এখন পাশের কামরায়। পালাবার আর পথ নেই।

এতটা লিখে কলমটা বন্ধ করলেন বিখ্যাত লেখক আশুতোষ ব্যানার্জি। কলমটা খাতার মধ্যে রেখে খাতাটা বন্ধ করলেন। আবার কাল লেখা যাবে, এই ভেবে তিনি খাতাটা বিছানার পাশে রেখে টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

দার্জিলিং মেল, পুলিশ, বনি—সবাই থমকে দাঁড়িয়ে। বনির খুব কষ্ট হচ্ছে। এত উত্তেজনা সে ধরে রাখতে পারছে না। কিছু একটা হোক। হয় এসপার, নয় ওসপার। কিন্তু কিছুতেই সে এক পা-ও নড়তে পারছে না। পুলিশও দাঁড়িয়ে আগের কামরায়, তারাও নড়ছে না।

এই অসহ্য স্থবিরতা বনিকে পাগল করে দিচ্ছে। তার চিৎকার করতে ইচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছে। কিন্তু সে দেখল যে সে তার নিজের ইচ্ছেমতো চিৎকারও করতে পারছে না। সব কিছুই যেন কোন অদৃশ্য সুতোর টানে স্তব্ধ হয়ে আছে—দার্জিলিং মেল, পুলিশ, সে নিজে এবং সময়।

সকালবেলা আশুতোষ বাবুর বাড়িতে হই-চই পড়ে গেছে। গত রাতে আশুতোষবাবুর একটা ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক করেছে। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। এখন উনি কোমায়, বাঁচার আশা নেই বললেই চলে। বাড়িতে কান্নাকাটির ধুম পড়ে গেছে।

অন্য প্রান্তে দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছিল। কথা হচ্ছিল অন্য ভাষায়। বাংলায় তর্জমা করলে এরকম দাঁড়ায়—প্রথম জন বলে, 'এবার আশুতোষবাবুর ফাইলটা ক্লোজ করে দেওয়া হোক।'

দ্বিতীয়জন হাত কচলে বলল, 'আপনি বললে তাই হবে। কিন্তু তাঁর মতো এমন সৎ মানুষের জন্য আর-একবার ভাববেন না স্যার?'

প্রথমজন বললেন, 'কেন কী অসুবিধা? বয়েস তো হয়েছে...

দ্বিতীয়জন বলে, 'আজ্ঞে, ষাট বছর দু-মাস বারো দিন। এটা কোনও বয়স হল?'

প্রথমজন বলে, 'ওঁর আর কী পাওয়ার আছে, বা আর কী করার আছে? পয়সাকড়ি তো আছে, দুই ছেলেই লায়েক হয়েছে।'

দ্বিতীয়জনের উত্তর, 'আজ্ঞে, লায়েক না, নালায়েক হয়েছে। দুটোই রাক্ষস। এর মধ্যেই সম্পত্তি নিয়ে তলায় তলায় কাজিয়া চালাচ্ছিল। আশুবাবুর স্ত্রীকে, মানে ওদের মাকে পথে বসিয়ে দেবে, এ আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি স্যার।

প্রথম জন একটু চিন্তিত ভাবে বলল, 'ও, তাহলে সম্পত্তি নিয়ে একটু লিটিগেশন আছে বলছ। বেশ তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কাল আশুবাবুর ঘর পরিষ্কার করতে এসে কাজের মহিলা খাটের নীচে একটা বাক্স পাবে। তাতে আশুবাবুর উইল থাকবে। তাতে থাকবে সমান ভাবে সম্পত্তি বন্টন করার ব্যবস্থা। ব্যস, হয়েছে তো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় জন বলে, 'আজ্ঞে স্যার, আশুবাবুর যে মেয়েটা মানসিক ভাবে স্থবির, মানে মেন্টালি রিটার্ডেট, তার কী হবে? দাদারা তো কেউ তাকে দেখবে না। তার মা-ই বা কতদিন থাকবে?'

প্রথম জন একটু ভেবে বলে, 'বেশ, দু-এক দিনের মধ্যে কোনও বিদেশি সংস্থা ওর আজীবনের দায়িত্ব তুলে নিতে আসবে। এবার হয়েছে তো? আশুবাবুর আর কোনও কাজ অসম্পূর্ণ নেই তো...।'

দ্বিতীয় জন বলে, 'আছে স্যার। বনি—'

প্রথম জন বিরক্ত হয়ে বলে, 'বনি! সে আবার কে? ওই পরিবারে বনি বলে তো কেউ নেই!

দ্বিতীয় জন বলে, 'আজ্ঞে, পরিবারে নেই, কিন্তু দায়িত্বে আছে।'

প্রথমজন বলে, 'কী রকম দায়িত্ব?'

দ্বিতীয়জন বলে, 'সে এখন ভীষণ বিপদের মধ্যে দার্জিলিং মেলে, পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আশুবাবুর অসম্পূর্ণ উপন্যাসের 'বনি' একটি চরিত্র। তার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ। কী হবে স্যার? ও কি যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়েই থাকবে, আশুবাবু লিখতে পারলেন না বলে?'

দু-দিন বাদে আশুবাবুর জ্ঞান ফিরল হাসপাতালে। সবাই বলল, এ একেবারে মিরাকেল! আশুবাবু তিনদিনের মাথায় বাড়ি ফিরে এলেন। বিকেল বেলায় মেয়ে তিতলি এসে তাঁর হাতে একটা খাতা দিয়ে বলল, 'বাবা, এটা তুমি লিখছিলে...'

আশুবাবু খাতাটা হাতে নিয়ে হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, তাই তো! এবার তো লিখতেই হবে। বনির ভাগ্য তো আমার হাতে'—বলে তিনি কলমটা নেওয়ার জন্যে হাত বাড়ালেন খাটের পাশের টেবিলের দিকে।

কিন্তু উনি জানেন না, বনির ভাগ্যের জন্য তিন দিন আগে বিধাতা কলম ধরে ফেলেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

অপদেব

অলোক সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই বাকি মুখগুলো মনে পড়ে। সে মুখগুলো মোটেই হাসিখুশি নয়। বিস্ফারিত—ভয়ে বা আশঙ্কায়।

অলোক সম্পর্কে আমিই নরমপন্থী। কারণ, আমি মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাস করি। অন্ধকারাচ্ছন্ন কুসংস্কার আমার পছন্দ নয়, আমি যুক্তিবাদী।

কিন্তু সেই আমিও বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে খুব একটা স্রোতের বিপরীতে যেতে পারতাম না, বন্ধুদের মার খাওয়ার ভয়ে। কারণ ছোটবেলা থেকেই আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটখাটো, পেটরোগা, ভীতু প্রকৃতির। আর একটা বয়সে গলার জোরের থেকে আয়ের জোরই মোক্ষম হাতিয়ার বলেই পরিগণিত হয়। আমরা এখন সেই বয়েস, যে বয়েসে স্বাস্থ্য ও শক্তিই বুদ্ধি বা যুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

লাঙল যার জমি তার, এক্ষেত্রে লাঙল হল স্বাস্থ্য বা শক্তি, আর জমি হল কর্তৃত্ব। লাঙল ছিল চন্দন, বুবু, বাপ্পাদের হাতে—সুতরাং ওরা যা বলবে তাই হবে—এরকমই বন্দোবস্ত পাকা ছিল। আর ওদের বক্তব্য, অলোক ভয়ংকর রকমের অপয়া, ওকে সঙ্গে রাখলে সব কাজ পণ্ড হবে।

হয়ও। রাজীব আমাদের দলের মধ্যে শান্ত ছেলে। বাড়িতে গানবাজনার একটা পরিবেশ আছে। নিজেও একটু-আধটু সরোদ বাজাত। ও আমাদের থেকে একটু বড়। আমাদের কুখ্যাতির শুরু সে-সময় থেকে। রাজীবের মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে, আমরা শ্যামবাজারে গেছি গেজেট দেখতে—সঙ্গে অলোক, অনেক খুঁজেও রাজীবের নাম লিস্টে পাওয়া গেল না। অর্থাৎ রাজীব ফেল করেছে।

কে একজন বলল, ওই অলোকটাই অপয়া।

সেই থেকে শুরু। তারপর নানান ঘটনা ওর দিকে এমন আঙুল নির্দেশ করল যে, অলোক এর পর থেকে পারমানেন্ট অপয়া হিসেবেই পরিচিত হয়ে উঠতে লাগল।

ফুটবল ম্যাচের ফাইনাল সেদিন। খেলা শেষ হতে পাঁচ মিনিট বাকি। এমন সময় প্রবল ঝড়, গাছ ভেঙে পড়তে লাগল ঘোষেদের মাঠে।

খেলা বন্ধ করতে হল। অথচ খেলার রেজাল্ট গোল-শূন্য। ঠিক হল সামনের রোববার আবার খেলা হবে।

কিন্তু বেঁকে বসল আমাদের এবং প্রতিপক্ষ দলের কয়েকজন। আমাদের দলের মধ্যে অলোক অবশ্যই একজন। ওদের বক্তব্য, আজই ফলাফল জানতে হবে। প্রবল ঝড়ের মধ্যে গাছ ভেঙে পড়ার আতঙ্কে তখন সবাই দিশেহারা। অলোকই বলে, টস হবে—যারা জিতবে তারাই চ্যাম্পিয়ন।

তাই হল। এবং আমরা হারলাম। এরপর বেশ কিছুদিন অলোক আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এড়িয়ে চলত মার খাবার ভয়ে।

বন্ধু প্রবীরের দাদার বিয়ে বসিরহাটে। বরযাত্রীরা বেরিয়ে যাবে বিকেল পাঁচটায়। আর আমাদের চার বন্ধুর পরীক্ষা দিয়ে পাড়ায় ফিরতেই পাঁচটা বেজে যাবে। সুতরাং সিদ্ধান্ত নিলাম, আমরা বন্ধুরা আলাদা যাব। একসঙ্গে।

অলোক ভালোভাবে বিয়েবাড়ির লোকেশন লিখে এবং জেনে নিল। প্রবীরের দাদা এবং বরযাত্রীরা চলে গেল নির্দিষ্ট সময়ে। আমরা চারজন বেরোলাম কিছু পরে।

কিন্তু বসিরহাট পৌঁছে দেখা গেল অলোক বিয়েবাড়ির ঠিকানাটা যে কাগজে লিখেছিল সেই কাগজটার বদলে ভুল করে লন্ড্রির বিলটা নিয়ে এসেছে। তারপর প্রায় রাত এগোরোটা পর্যন্ত চলল আমাদের অভিযান। কিন্তু বিয়েবাড়ি আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

খিদে এবং ক্লান্তি নিয়ে আমরা যখন বাড়ি ফিরলাম তখন প্রায় মাঝরাত। কিছুদিন আমরা অলোককে বয়কট করলাম। পরে যদিও ও আবার ভিড়ে গেছিল আমাদের মধ্যে।

পড়াশুনোর পাঠ শেষ—এবার কর্মজীবনে ঢোকার পালা। একে একে সবাই চাকরি পেতে লাগল। আমিও একটা চাকরির অফার পেলাম—ইন্টারভিউ দিতে যেতে হবে দিল্লিতে, একটা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি, ম্যানেজারের চাকরি। নিজস্ব ফ্ল্যাট, গাড়ি, কুড়ি হাজার টাকা মাইনে।

আমি তো আনন্দে আটখানা! বন্ধুদের জানাতে সবাই একবাক্যে বলল, চলে যা, এমন সুযোগ বারবার আসে না।

অলোক বলল, আমি তোকে হাওড়া স্টেশনে দিয়ে আসব।

সবাই চিৎকার করে উঠল, না, না, ও ব্যাটা যেন কখনোই না যায়।

আমি বললাম, আমি এধরনের কুসংস্কারে বিশ্বাসী নই—ও যদি যেতে চায় যাবে।

আমার সেবার দিল্লি যাওয়া হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেশনে গিয়েও যাওয়া হল না ট্রেনে সিট দেখে-টেখে জল নিতে নীচে নেমেছিলাম। এবং স্টেশনে পা পিছলে পড়ে পায়ের মালাইচাকি ভেঙে গুড়িয়ে গেছিল। অলোকই আবার আমায় বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল।

স্টেশনে ট্রেনে ওঠার সময় একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—সে-ও যাচ্ছিল একই জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে। পরে শুনেছিলাম সেই পবন মলহোত্রা চাকরিটা পেয়েছিল। তারপর দীর্ঘদিন আমি অলোকের মুখদর্শন করিনি।

বছর পাঁচেক কেটে গেছে। আমরা সবাই মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। আমি একটা সরকারি অফিসে চাকরি করি, এখন বেহালায় থাকি। বহুদিন পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয় না। একদিন বাপ্পা ফোন করে বলল, সামনের রোববার চলে আয়, সবাইকে ডেকেছি, অনেক দিন জমিয়ে আড্ডা হয় না।

যথাসময়ে পৌঁছে গেলাম পুরোনো পাড়ায়। ভেসে গেলাম নষ্টালজিয়ায়। আমাদের কথা থামতেই চায় না। এক সময় ঠিক হল, ভেটরিনারি কলেজের মাঠটায় গিয়ে বসব—মেঘলা বিকেল, আড্ডা জমে যাবে।

বিশাল মাঠের মাঝখানে গিয়ে বসলাম আমরা ছ'জন, বাকিরা নানান কাজে ব্যস্ত, আসতে পারেনি। বলা বাহুল্য, অলোকও আমাদের মধ্যে ছিল।

কথায় কথায় খেয়াল করিনি, আকাশ কালো করে মেঘ জমছে। একসময় উঠল ঝড়, ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করল। আর প্রচণ্ড শব্দ করে বাজ পড়তে লাগল। হঠাৎই একটা বাজ পড়ল মাঠের উত্তর কোণের একটা তালগাছে। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

আমরা ভয়ে দৌড়োতে লাগলাম। শেষে আশ্রয় নিলাম মাঠেরই এককোণের একটা ভাঙা বাড়িতে। বাড়িটার জানলা-দরজা নেই—মাথার ছাদেরও অর্ধেকটা নেই।

এদিকে বৃষ্টি-ঝড়ের দাপট বেড়েই চলেছে। কান ফাটিয়ে বাজ পড়ছে। আমাদের সবার মুখ শুকিয়ে গেছে। বুঝতে পারছি, আমরা মৃত্যুর দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। দূরে বসতিগুলোয় শঙ্খ বাজানো শুরু হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রলয়ের পূর্বাভাস। আমরা ভিজে চপচপ করছি। একটা বাজ পড়ল আমাদের সামনের পুরোনো বটগাছটার ওপর। আগুন জ্বলে উঠল। কাঠ পোড়ার গন্ধে আমাদের দম বন্ধ হওয়ার জোগাড় হয়ে গেল।

হঠাৎ বাপ্পা চেঁচিয়ে উঠল, এ শালা অপয়াটার জন্য আমাদের মরতে হবে। সবাই রে-রে করে উঠল, ঠিক, ঠিক।

আবার একটা বাজ পড়ল। কাছেই। ভয়ে সবাই কেমন হিস্টিরিয়াগ্রস্থ রোগীদের মতো ব্যবহার করছে। কেউ কেউ কাঁদছে, কেউ অনর্গল গালাগাল দিচ্ছে। বাপ্পার মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। এই অপয়াটাকে বের করে দে। ওর জন্যই অপঘাত আমাদের পিছু নিয়েছে।

সবাই মিলে অলোককে ঠেলে ভাঙা বাড়িটা থেকে বার করে দিল।

ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে অলোক অসহায়ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বসতির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

প্রবল বিদ্যুৎ-চমক আর কান-ফাটানো আওয়াজে আমরা সবাই কাঁপছি। বাপ্পা পাগলের মতো বলছে—এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। অপয়াটাকে দূর করেছি...

হঠাৎই আমার মনে হল, আমরা কি ঠিক করলাম? আমার মনে পড়ে গেল, রাজীব যদি মাধ্যমিকে ফেল না করত তাহলে ওকে আমাদের মতো ছাপোষা কেরানিই হতে হত। অথচ এখন রাজীব একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সরোদ বাদক। ওর নামের আগে পণ্ডিত শব্দটা বসানো হয়।

বোসেদের মাঠে সেদিন যদি আমরা টসে না গিয়ে পরের রবিবার খেলতে যেতাম তাহলে আমরা হয়তো হারতাম না ঠিকই, কিন্তু সেই রবিবার ভূমিকম্পে বোসেদের মাঠ ধসে গেছিল, এখন সেটা একটা জলা।

প্রবীরের দাদার বিয়েতে আমরা যেতে পারিনি। কিন্তু পরে জেনেছিলাম, ওই বিয়েবাড়িতে খেয়ে তিরিশ জনের বিষক্রিয়া হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। দুজনের মৃত্যুও হয়েছিল।

স্টেশনে পড়ে গিয়ে আমার চাকরিটা হয়নি। হয়েছিল পবন মলহোত্রার। কিছুদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে দেখলাম চিটফান্ড কেলেঙ্কারীতে বহু লোক এখন জেলে। পবন মলহোত্রা তাদের মধ্যে অন্যতম।

তার মানে আমরা যা দেখেছি তা তাৎক্ষণিক। সুদূর ফলাফলটা কেউ-ই লক্ষ করিনি। আজ মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে কি আমার চোখ খুলল!

লক্ষ করছিলাম তীব্র গতিতে বিদ্যুতের রেখাটা লক্ষ্যবস্তুগুলোর ওপর আছড়ে পড়ছে। আর তিন সেকেন্ড বাদে কানফাটানো শব্দটা শোনা যাচ্ছে...

আলো শব্দের থেকে দ্রুতগতিসম্পন্ন। তাই বোধহয় ঝড়-জল-বিদ্যুতের মধ্যে দেখলাম অলোক ধীরে ধীরে একটা বিন্দুতে পরিণত হচ্ছে...

ওদিকটা তেমন বাজ পড়ছে না। বাজ পড়ছে আমাদের এই ভাঙা বাড়িটাকে কেন্দ্র করে।

একটা নীলচে বিদ্যুতের শিখা এবার এই ভাঙা সুকলবাড়িটার ওপর আছড়ে পড়ল। তিন সেকেন্ড বাদে শব্দটা আর শোনা হল না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

টোটেম

অর্ণব আমার বাল্যবন্ধু। ছোটবেলায় এক সুকলে পড়েছি, একই পাড়ায় থেকেছি, কলেজে গিয়ে আলাদা হয়ে গেছি—কিন্তু পাড়ায় একই ছিলাম। একই রকে আড্ডা মেরেছি, একসঙ্গে সরস্বতী পুজো করেছি, বিস্তর বাঁদরামিও করেছি।

অর্ণব পড়াশুনোয় খুব ভালো ছিল—একটা সময় এল, আমাদের যোগাযোগ ছিন্ন হল, ও পড়াশুনো করতে চলে গেল বিদেশে, আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম গান-বাজনা নিয়ে। বহুদিন একে অপরের খোঁজও নিইনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎই একদিন শুনলাম অর্ণব এখন একজন পৃথিবী বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ। সারা পৃথিবী তার লেখা পড়ে হইহই করছে। এদিকে আমারও একটু-আধটু নাম হয়েছে, এদিক-ওদিক থেকে লোকে গান শোনার জন্য ডাকেও।

মজাটা হল এবার অস্ট্রেলিয়ায় গান গাইতে গিয়ে। বাঙালিদের বৈশাখী উৎসবে অলিম্পিক স্টেডিয়ামে আমার অনুষ্ঠান । হাজার পনেরো মানুষের সমাগম হয়েছে। আমি গ্রিনরুম থেকে পৌঁছোলাম স্টেজে। উপস্থাপক ঘোষণা করল, আয়োজকদের পক্ষ থেকে দুজন বিখ্যাত বাঙালিকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। একজন আমি—যে এক্ষুনি গান শোনাবে, আর-একজন বাঙালি যিনি হঠাৎই অস্ট্রেলিয়া এসেছিলেন অন্য কাজে—তাকে অনুরোধ করায় তিনি কিছুক্ষণের জন্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাজি হয়েছেন। তিনি পৃথিবী বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ড. অর্ণব সেন।

আমি তো অর্ণবকে স্টেজে দেখে অবাক। অর্ণব মিটিমিটি হাসছিল। কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরার সময় কানে-কানে বলল, 'তোর জন্যই এসেছি রে ব্যাটা।'

তারপর অর্ণব আমার পুরো অনুষ্ঠানটাই দেখল। গানের পর আমায় নিয়ে চলে গেল ওর হোটেলে।

আমরা সারা রাত আড্ডা মেরেছিলাম। এই হল আমাদের দ্বিতীয়বার বন্ধুত্বের শুরু। সেই অর্ণবই আজ মেল করেছে, 'আগামী শুক্রবার কলকাতায় আসছি। কোনও নিরিবিলি জায়গা জোগাড় কর। একটু একা থাকব।'

মানে আমরা দুজন। নো থার্ড পার্সন। আমিও উত্তর দিয়ে দিলাম। তথাস্তু। সুন্দরবনের কাছে আমার এক ভক্ত হলধরের একটা বাগানবাড়ি আছে। অনেকদিন ধরে যাওয়ার জন্য ও ঘ্যানঘ্যান করছিল। আমারও নানা কাজে যাওয়া হচ্ছিল না।

তাকে ফোন করে বললাম, 'আমি যাব, কিন্তু কেউ যেন না জানে। আমার সঙ্গে আমার এক বন্ধু যাবে। সে লোকজন খুব একটা পছন্দ করে না। সুতরাং নো কোলাহল।

অবশেষে শুক্রবার এসে গেল। এয়ারপোর্ট থেকে অর্ণবকে তুলে ওর হোটেলে নিয়ে গেলাম। বললাম, 'আজ ঘুমো, কাল ভোরবেলা তোকে নিয়ে বেরিয়ে যাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুন্দরবন। তারপর দুই বন্ধু—আর নির্জনতা।'

ও বলল, 'নচি, আজকেই তোদের একটা বিখ্যাত পত্রিকার জন্য একটা লেখা দিতে হবে। ঘুমের দফাগয়া।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী নিয়ে লিখবি?'

ও বলল, 'টোটেম।'

আমি বললাম, 'সে আবার কী?'

ও বলল, 'সে অনেক কথা বলতে হয় তাহলে...কাল যেতে-যেতে বলব।' আমিও আর সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে চলে গেলাম।

পরদিন অর্ণবকে নিয়ে রওনা দিলাম সুন্দরবন অভিমুখে। রাস্তার বর্ণনা দিয়ে পাতা ভরতি করব না—তবে হ্যাঁ, রাস্তায় একটা হোটেলে খেতে গিয়ে একটু অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিলাম। কারণ, কিছু লোক আমায় চিনতে পেরেছিল। তারপর যা হয়, অটোগ্রাফ, সেলফি ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা দুপুর নাগাদ হলধরের বাগানবাড়িতে পৌঁছোলাম। আমরা মানে আমি, অর্ণব আর আমার ড্রাইভার মোক্তার। বাগানবাড়িটা বেশ চমৎকার। সামনে বিশাল বাগান, পুকুর। পুরো বাড়িটাই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। গেটে একজন দারোয়ান। সুতরাং নিরাপত্তা পাকা। নো আউট-সাইডার।

হলধর দরজা থেকে আমাদের নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। বলল, 'দুটো ঘর মুখোমুখি খুলে দিয়েছি আপনাদের দুজনের জন্যে। মোক্তার ভাইয়ের ব্যবস্থা নীচে করেছি।'

অর্ণব বলল, 'দুটো ঘর কী হবে? এতদিন পরে দেখা। আলাদা-আলাদা থাকলে গল্প করব কখন? একটা ঘরেই দুটো সিঙ্গল বেড লাগিয়ে দাও। ততক্ষণ আমরা একটু বাগানটা দেখে আসি।'

আমি হেসে ফেললাম, ভাবলাম এতবড় একজন মানুষ হওয়ার পরেও অর্ণব একটুও বদলায়নি। সে এখনও ছেলেমানুষ।

আমার অনুমান যে নির্ভুল তা-ও প্রমাণ হয়ে গেল। বাগানে পৌঁছে অর্ণব হঠাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা গাছে উঠে পড়ল। তারপর জামাকাপড় পরেই পুকুরে ঝাঁপ মারল। উঠে বলল, 'আমার এখন হাল্লা রাজার মতো বলতে ইচ্ছে করছে—ছুটি, ছুটি।' বলে হাল্লা রাজার মতোই দৌড় মারল।

আমার তো হাসতে-হাসতে দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়।

সেদিনটা কেটে গেল। পরের দিন আমি ঘুম থেকে আগেই উঠলাম। দেখলাম অর্ণব মড়ার মতো পাশের খাটে ঘুমোচ্ছে। সত্যিই তো, জার্নি কম হয়নি।

আমি নীচে এসে লনে কফি নিয়ে বসলাম। এমন সময় বাড়ি থেকে আমার সেক্রেটারি মৈনাকের ফোন এল, 'আপনারা ঠিক আছেন তো?'

আমি বললাম, 'এই বেশ ভালো আছি।'

মৈনাক বলল, 'তাই থাকুন। আজ আপনার বন্ধুর একটা বড় লেখা কাগজে বেরিয়েছে। একটু পড়ার চেষ্টা করছিলাম—কিন্তু মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। কি যেন একটা বিষয়...টোটা না কী যেন।'

আমি বললাম, 'না, না, টোটা নয়, টোরেম।'

এমন সময় পাশ থেকে কে যেন বলল, 'টোরেম নয়, টোটেম।'

দেখলাম, অর্ণব ঘুম থেকে উঠে আমার পাশের চেয়ারটা দখল করেছে।

আমি মৈনাকের ফোনটা রেখে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এবার বল তো, এই টোটেম বস্তুটা কী?'

ও হাই তুলতে তুলতে বলল, 'টোটেম মানে চিহ্ন। অর্থাৎ, কোনও গোষ্ঠী যে-চিহ্নটাকে নিজেদের পরিচয়ের বা অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে রাখে।'

আমি জানতে চাইলাম 'কী করে?'

অর্ণব এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'ওই দ্যাখ, গাছে ওটা কী?'

আমি তাকিয়ে দেখে বললাম, 'বাঁদর।'

ও বলল, 'ইয়েস, এই বাঁদরটাও একটা চিহ্ন হয়ে উঠতে পারে কোনও মানুষ বা গোষ্ঠীর কাছে—যারা এই চিহ্নটাকেই নিজেদের গোষ্ঠী-পরিচয় হিসাবে গ্রহণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পারে।

আমি বললাম, 'বাঁদর মার্কা কালা দন্তমঞ্জন।'

ও বলল, 'তার থেকেও বড় হতে পারে। একটা বিশাল বড় গোষ্ঠী নিজেদের কোনও প্রাণী ভেবে গর্বিত হয়, সন্তুষ্ট হয়।

আমি বললাম, 'মানুষ কেন নিজেকে অন্য প্রাণীর মতো করতে চাইবে?'

ও বলল, 'কেন চাইনিজ মার্শাল আর্টের ছবি দেখিস না? ঈগল্স মুভমেন্ট, টাইগার'স প' । ওরা কেন ওদের মার্শাল আর্টের মধ্যে অন্য প্রাণীর মুভমেন্ট আমদানি করেছে?'

আমি বললাম, 'এগুলো তো গল্প-কথা—সিনেমার স্ক্রিপ্ট।'

ও বলল, 'মোটেই না। চিন দেশে এখনও প্রচুর গুপ্ত সংঘ আছে। ড্রাগন গ্রুপ, টাইগার ব্রাদার্স ইত্যাদি, যারা এক-একটা বিশেষ চিহ্ন বহন করে। এবং তার জন্যে গর্বিত।'

আমি বললাম, 'সে তো হলধরের নামের পিছনেও সিংহ আছে। তার মানে কি হলধর সিংহের টোটেমিস্ট?'

অর্ণব বলল, 'বাঃ, এটা তো ভালো একটা ক্লু দিয়েছিস। বেশ, তোকে এবার ভালো করে বোঝাচ্ছি। বল, লঙ্কায় রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে রামচন্দ্রকে কারা সাহায্য করেছিল?'

আমি বললাম, 'বানর সেনা।'

ও বলল, 'কোনও বানরকে দিয়ে সংগঠিত যুদ্ধ করানো যায়? সমুদ্রের মধ্যে অত বড় সেতু তৈরি করানো যায়?'

আমি বললাম, 'রামচন্দ্র তো ভগবান, ভগবান সবই পারে।'

অর্ণব এবার হাসতে থাকে। বলে, 'তোরা কি কিছুতেই বুঝবি না—বানর সেনারা আসলে মানুষই ছিল। বালী, সুগ্রীব, হনুমান এরা আসলে এক-একটা পার্বত্য উপজাতির নেতা ছিলেন। এরা বানর নয়, বানরের টোটেম ব্যবহার করত।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, 'বানর নয়, তা হলে হনুমান এত লাফঝাঁপ দিত কী করে? বুঝলাম, গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে আসাটা একটু অতিরঞ্জিত—কিন্তু কিছু তো সত্যি।'

অর্ণব বলল, 'ওই হল মনস্তত্ত্ব। একটা জাতি বা গোষ্ঠী একটা প্রাণীর সঙ্গে একাত্ম হতে-হতে পুজো করতে-করতে খানিকটা তো তার মতো হবেই। একজন ইংরেজি না জানা লোককে ইংরেজদের মধ্যে দীর্ঘদিন রাখলে সে যেমনভাবে তাদের ভাষা আয়ত্ত করে, তেমন।'

আমি বললাম, 'কিন্তু হনুমানের তো লেজ ছিল।'

ও আবার হাসে, বলে, 'আফ্রিকায় মাসাইরা সিংহ মেরে তার ছাল গায়ে জড়িয়ে রাখে। নিজেরা সিংহ সাজে। নিজেদের সিংহ ভাবে। ওটা হনুমানের নিজের লেজ নয়। যেমন, জাম্বুবান কোনও ভালুক নয়—উনি ভালুকের টোটেমিস্ট। ভালুকের টোটেম ব্যবহার করতেন। ভালুকের ছাল গায়ে জড়িয়ে রাখতেন—উনি আর ওনার গোষ্ঠীর লোকেরা। বুঝলি। এই যে শুনতি, উনি সূর্যবংশীয় রাজা, তার মানে কি সূর্য ওদের পূর্বপুরুষ? না। আসলে উনি বা ওনারা সূর্যের টোটেম ব্যবহার করতেন। যদি চন্দ্রবংশীয় হন, তা হলে চন্দ্রের টোটেম ব্যবহার করতেন। সেই যে বাসুকী, যিনি কৃষ্ণকে বাঁচিয়েছিলেন। তিনি কি আসলে একটা সাপ? মোটেই না—তিনি নাগবংশের একজন রাজা। নাগবংশ মানে নাগের টোটেম ব্যবহার করা একজন মানুষ। বাসুকীর যা বর্ণনা আছে তাতে বলা হচ্ছে, বাসুকীর অনেকগুলো ফণা। সব ফণার মাথায় মণি চকচক করছে। কী রে? বিষয়টাকে মুকুট বলে মনে হচ্ছে কি না বল? কালিয় নাগ—সে কি আসলে সাপ ছিল? সে-ও এক অরণ্য উপজাতির নেতা ছিল। সে সাপের টোটেম ব্যবহার করত।'

আমি এবার বললাম, 'বেশ, বেশ, বুঝেছি। বাচ্চু একেবারে লেকচারের ক্লাস বানিয়ে দিয়েছিস।'

ও হাসে, বলে, 'তুই তো শুরু করলি।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, তোর বিষয় তো মনস্তত্ত্ব, তার সঙ্গে টোটেমের কী সম্পর্ক?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্ণব এবার কফি খেতে-খেতে বলল, 'মনস্তত্ত্ব একটা বিরাট ব্যাপার। তুই সত্যিই শুনবি? না কি বলবি ক্লাস নিচ্ছি?'

আমি বললাম, 'না, না, ক্লাস নেওয়ার মতো করে বলার দরকার নেই। সহজভাবে সহজ কথায় বল।'

অর্ণব হাসতে থাকে। বলে, 'তুই একইরকম অধৈর্য শীল রয়ে গেলি। শোন, টোটেম আসলে মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন হনুমান—বাঁদরের টোটেম তার মনস্তত্ত্বকে প্রভাবিত করেছিল বলেই তার কীর্তিকলাপগুলো তেমনই—গন্ধমাদন নিয়ে আসা, লঙ্কায় অগ্নিকাণ্ড, অশোকবনে তাণ্ডব—ইত্যাদি, ইত্যাদি। মাসাইরা সিংহের টোটেম ব্যবহার করে বলেই তারা—নির্ভীক, হিংস্র, কষ্টসহিষ্ণু—সিংহের মতো। কালিয় নাগ—সাপের টোটেম ব্যবহার করত বলেই সে ছিল ক্রুর, বিষধর। নদীর জলে বিষ মেশাত। সাপের মতো। আসলে টোটেম নিয়ে আমি বহু বছর ধরেই গবেষণা করেছি। তুই আমাদের বিষয় সম্পর্কে বিশেষ খোঁজখবর রাখিস না বলেই ঠিক জানিস না। মনস্তত্ত্ববিদ মানে ভাবিস পাগলের ডাক্তার।'

আমি হেসে বললাম, 'ঠিক বলেছিস।'

অর্ণবও হাসতে থাকে।

দু-দিন পার হয়ে গেছে—একটা বিপদ হয়েছে। স্থানীয় খবরের কাগজে একটা খবর বেরিয়ে গেছে যে, আমি এখানে এই বাগানবাড়িতে আছি। সঙ্গে আমার বন্ধু ড. অর্ণব সেন।

ব্যাস, আর কী, লোকজনের ভিড় শুরু হয়ে গেছে। যদিও তা গেটের বাইরে। দারোয়ানকে টপকে কেউ ঢুকতে পারেনি। আমি হলধরের ওপরে একপ্রস্থ নিলাম। হলধর খুবই বিব্রত। ওর বক্তব্য ওর দিক দিয়ে খবর লিক হয়নি।

আমাদের কোনও অসুবিধে হয়নি। খাওয়াদাওয়া, পুকুরে সাঁতার কেটে আর মাছ ধরে সময় কেটে যাচ্ছিল ভালোমতোই।

ঘটনাটা ঘটল চতুর্থ দিনে—।

সকালে আমরা দুজনে ব্রেকফাস্ট করছিলাম। এমন সময় দারোয়ান এসে বলল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'একজন ভদ্রমহিলা দেখা করতে চাইছেন।'

আমি অর্ণবকে বললাম, 'দেখ, শান্তি নেই—।'

অর্ণব বলল, 'ভায়া, একেই বলে খ্যাতির বিড়ম্বনা।'

আমি দারোয়ানকে বললাম, 'বলে দাও, আমি দেখা করব না।'

দারোয়ান ইতস্তত করে বলে, 'উনি আপনার সঙ্গে না, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

আমি আর অর্ণব একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

আমি অর্ণবকে বললাম, 'কী রে, মহিলা তোর নাম করে আমার অটোগ্রাফ নেওয়ার তালে নেই তো?'

অর্ণব ভুরু কুঁচকে বলে, 'হতেই পারে, এই গণ্ডগ্রামে আমায় কে চিনবে!'

দারোয়ান বলে, 'ভদ্রমহিলার নাম শকুন্তলা দেবী—নিজেই গাড়ি চালিয়ে অনেক দূর থেকে এসেছেন।'

আমি অর্ণবের দিকে তাকালাম। অর্ণবের দু-চোখে গভীর দুশ্চিন্তার ছায়া। একসময় দুজনে একমত হয়ে দারোয়ানকে বললাম, 'ঠিক আছে, ওনাকে আসতে বলো।'

একটা বড় স্করপিও মোরামের রাস্তা ধরে এগিয়ে এল। গাড়িটা থামলে একজন মহিলা নামলেন। চোখে সানগ্লাস, পরনে নীল রঙের জিন্স, সাদা রঙের একটা জামা, ছিপছিপে চেহারা, মাথায় কাচাপাকা ছোট চুল, পেছন থেকে দেখলে ছেলেই মনে হবে। পায়ে স্পোর্টস শু।

ভদ্রমহিলা সোজা এসে আমাদের নমস্কার করলেন।

'আমি শকুন্তলা বাসু। আমি এখান থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরে "বাজো" নামে একটা জায়গায় থাকি। জায়গাটা বনাকীর্ণ এলাকা। আমি ড. অর্ণব সেনের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আপনাদের মধ্যে কে ড. সেন?'

আমি একটু অবাক হলাম। এই রাজ্যে থাকে, আর আমায় চেনে না!

আমি বললাম, 'উনি অর্ণব সেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শকুন্তলা দেবী বললেন, 'ওঃ, তা হলে আপনিই সেই বিখ্যাত গায়ক?'

আমি একটু হাসলাম। উনি বললেন, 'আমি খবরের কাগজে দেখলাম, ড. সেন আপনার সঙ্গে এখানে আছেন। তাই ছুটতে-ছুটতে এলাম।

আমি ড. সেনকে গত এক বছর ধরে খুঁজছি। কী আশ্চর্য দৈবযোগ।

হঠাৎই দেখুন—উনি এখানে। আসলে মাপ করবেন, আমি আপনার গান শুনিনি, ছবিও দেখিনি।'

আমি একটু নয়, বেশ অবাক। আমায় চেনে না অথচ এই গণ্ডগ্রামে অর্ণব সেনকে কেউ চিনতে পারে—তা আমি ভাবতে পারছিলাম না। অর্ণবের দিকে তাকিয়ে দেখি তার চোখেও সেই সন্দেহের মেঘ।

শকুন্তলা দেবী কিন্তু বেশ স্বাভাবিক। উনি আমাদের ভেতরকার সন্দেহের টানাপোড়েন বুঝতেই পারছিলেন না। আমি ওনাকে বললাম, 'কফি খাবেন?'

উনি বললেন, 'খেতে পারি। ভোরবেলা কিছু না খেয়েই বেরিয়ে পড়েছিলাম।'

আমি কাজের লোকটাকে কয়েকবার ডাকলাম, কিন্তু সাড়া পেলাম না।

অর্ণব বলল, 'আরে, ও তো বাজারে গেছে।'

আমি বললাম, 'অতঃ কিম?'

শকুন্তলা দেবী বললেন, 'আপনারা যদি আমায় রান্নাঘরটা দেখিয়ে দেন তা হলে আমিই কফি বানিয়ে আনতে পারি।...যদি না কিছু মনে করেন।'

আমরা আর কী বলি—কিছুক্ষণ পর উনি একটা সুন্দর ট্রে এবং পটে করে কফি নিয়ে এলেন। মুখে দিয়ে বুঝলাম উনি পাকা রাঁধুনি।

নানা বিষয়ে কথা হতে-হতে আমি ও অর্ণব একটা সময় যখন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছি, তখনই শকুন্তলা দেবী বলে উঠলেন, 'ড. সেন, আমি আপনার স্প্লিট পারসনালিটি এবং টোটেম সম্পর্কিত সব লেখা পড়েছি।'

অর্ণব অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'কী করে?'

উনি বললেন, 'কেন সাইট থেকে! আপনি যে বলেছেন, মানুষের পদবিও আসলে এক ধরনের টোটেম তা-ও পড়েছি। জন রিভার আসলে নদীর টোটেমের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষুদ্র সংস্করণ। দেবব্রত রায়, আসলে রায় মানে মতামত বা অনুশাসনের সংস্করণের আরেক নাম। এ সবই পড়েছি। আপনি ড. জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইডের সম্পর্ক যে বলেছেন আসলে স্প্লিট পারসনালিটি, তা-ও পড়েছি। যে-কোনও সাধারণ মানুষের মধ্যেও যে স্প্লিট পারসনালিটি বা দ্বৈত সত্তা কাজ করে তা-ও বুঝেছি। বিশ্বাস করুন, আমি আপনার সব লেখা পড়েছি। গত এক বছর ধরে আমার মনে হয়েছে, আপনি সব জানেন, সব পারেন। পারেন এই জন্যে বললাম, কারণ—যে-মানুষটা রোগের উৎস বোঝে সে লোকটা নিরাময়ও বোঝে। দু-মাস আগে আপনিই বলেছেন—আমি সাইটে পড়েছি—"যে-কোনো রোগই নিরাময়যোগ্য, যদি সঠিক সময় এবং সঠিক পরিবেশ পাওয়া যায়।"

'ড. সেন, আমি আপনার ফ্যান—অন্তত গত এক বছর ধরে। আমি জানি, আপনি জনি ফন্টেনের মতো একজন সিরিয়াল কিলারকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে এনেছেন। সে এখন আলাস্কার অভিযাত্রীদের গাইড। আপনি আটবার সুইসাইড করতে চাওয়া হেলি ব্রাউন—এর মতো মানুষকে ডাক্তারি পাশ করিয়ে-ইথিওপিয়ার রোগগ্রস্ত মানুষদের সেবার কাজে পাঠিয়েছেন। আমি আপনার আরও শত-শত কাজের কথা জানি।'

অর্ণব এবার উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়, তারপর হাঁটতে শুরু করে। হাঁটতে-হাঁটতে সামনের বাগান কাম জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যায়—এবং হারিয়ে যায়।

এবার সঙ্কটটা বড়ই ভীষণ। কারণ, এবার মুখোমুখি আমি আর শকুন্তলা দেবী।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি ওনাকে বললাম, 'আমার বন্ধু এখানে বেড়াতে এসেছেন একা থাকবেন বলে। আপনি ওকে আবার ড. অর্ণব বানিয়েছেন, যেটা ওর মনে হয় পছন্দ হচ্ছে না।'

শকুন্তলা দেবী কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই দেখলাম হাসতে-হাসতে অর্ণব ফিরে আসছে। আমি নিশ্চুপ।

'কী রে ব্যাটা—সবাই নাকি তোকেই চেনে—এই পাগলের ডাক্তারটাকে কেউই চেনে না?' অর্ণবের গলা শোনা যাচ্ছে দূর থেকেও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বুঝলাম, ওর ইগোতে লাগছে। আমায় কেন্দ্র করে সব কিছু দেখে-দেখে।

আমি চিৎকার করে বললাম, 'ডাক্তারবাবু, আমি একজন বাইজি। মানুষ ডাক্তারের থেকে বাইজিকে বেশি চেনে। কারণ বাইজি শিক্ষিত নয়। অন্তত সমাজের ভাষায়—।'

অর্ণব ততক্ষণে কাছে এসে গেছে। বলে ওঠে, 'দুর পাগল, আমি তো মজা করছিলাম—কৃষ্টি বাদ দিয়ে একটা জাতি জাতিই থাকে না। তোরা অনেক বড় কাজ করিস রে। বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে কর্মরহিত, মানে, কর্মবিমুখ করে। আরও সোজা কথায়, বিজ্ঞান মানুষকে অলস করে। আর সংস্কৃতি মানুষকে ভাবতে শেখায়। তোরা অনেক বড় কাজ করিস। আমি একটু ইয়ার্কি করছিলাম তোর সঙ্গে—কিন্তু শকুন্তলা দেবী, আপনি আমার কাছে খুব বিস্ময়কর একজন মানুষ হয়ে দাঁড়ালেন। আপনি আমার ফ্যান, অথচ আপনি এই গণ্ডগ্রামে থাকেন কী করে?'

শকুন্তলা দেবী ততক্ষণে আমাদের ব্রেকফাস্ট তৈরি করে (অবশ্যই রামুর সাহায্যে। সে এতক্ষণে বাজার ফেরত) টেবিলে রাখতে-রাখতে এবং আমাদের দুই বন্ধুর দ্বৈরথ দেখতে-দেখতে হাসছিলেন।

এবার বললেন, 'আমার বয়েস আটচল্লিশ। আমি J N U থেকে পাস আউট। আমার স্বামী রজত বাসু বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ। তিন বছর আগেই ভল্যানটিয়ারি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে আমরা এখানে আছি। বিলুপ্ত বন্যপ্রাণীদের বিলুপ্ত হওয়ার কারণ জানার জন্যে,—এটা আনফিসিয়াল একটা রিসার্চের জন্যে। এবার বুঝলেন, কী করে এত আপডেটেড আমি।...

ও সরি, এখানে আমিই আমার স্বামী রজত বাসুর অ্যাসিস্ট্যান্ট। আমাদের কাছে ল্যাবরেটারি আছে, কমপিউটার আছে, ইনটারনেট আছে, টেলিপ্রিন্টার আছে, সবই আছে। আমাদের এতটা গেঁয়ো ভাববেন না, ড. সেন।

ওঃ, আরেকটা কথা—এখানে তো খবরের কাগজ আসে না, আপনাদের আসার খবরটাও নেটেই পেয়েছি। মানে, পড়েছি। এবার কি আমায় একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিভিলাইজড মনে হচ্ছে?'

আমি আর অর্ণব একে অপরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকি। তারপর হেসে ফেলি নিজেদের মূর্খতায়।

শকুন্তলা দেবী এবার সরাসরি অর্ণবের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ড. সেন, আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী। সমস্যাটা আমাকে নিয়ে নয়—আমার স্বামী রজত বাসুকে নিয়ে।'

অর্ণব একটু ঝুঁকে বলে, 'কী হয়েছে আপনার স্বামীর?'

শকুন্তলা দেবী একটু ইতস্তত করে তারপর বলেন, 'গত একবছর ধরে আমার স্বামী নিজেকে একটা জানোয়ার মনে করছে। শুধু মনেই করছে না—বিহেভও করছে।'

আমরা দুজনেই চুপ।

এক সময় নৈঃশব্দ ভেঙে অর্ণব বলল, 'কীরকম বিহেভ করছে?'

শকুন্তলা দেবী বললেন, 'কী ভাবে বলব...কাঁচা মাংস খাচ্ছে, জামাকাপড় পরছে না। খাটে শুচ্ছে না—খাটের নীচে শুচ্ছে। চাকরবাকর সব ছাড়িয়ে দিয়েছি। ওকে প্রায় ঘরবন্দি করেই রাখতে হচ্ছে।'

অর্ণব চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। এবার বলে, 'শকুন্তলা দেবী, আপনার স্বামীকে একটু দেখা যায়?'

শকুন্তলা দেবীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, 'এগজ্যাক্টলি। এখানে আমি সেই আশা নিয়েই এসেছিলাম—যাবেন? আমাদের বাড়িটা এখান থেকে ঘণ্টা দুইয়ের পথ।'

অর্ণব আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'চল, ঘুরে আসি।'

আমি তো কৌতূহলে মরেই যাচ্ছিলাম। অর্ণবের কথায় স্বস্তি পেলাম।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

আমরা দুজন শকুন্তলা দেবীর গাড়িতে, আর আমাদের পেছনে মোক্তার আমাদের গাড়ি নিয়ে। যাতে ফেরার সময় শকুন্তলাকে আর আসতে না হয়।

রাস্তা খুবই খারাপ। শকুন্তলা দেবী অবশ্য খুব ভালো ড্রাইভার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, 'আপনি তো দারুণ ড্রাইভার!'

শকুন্তলা দেবী বলেন, 'কী আর করব—এই জঙ্গলে লোক কোথায় পাব! যারা ছিল সবাইকে বিদায় করে দিতে হয়েছে। এখন আমাকেই জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করতে হয়। আমার খুব একটা অসুবিধে হয় না—শুধু মাথার ব্যথাটা মাঝে-মাঝে কাহিল করে দেয়।'

অর্ণব বলে, 'মাথায় কীসের ব্যথা?'

শকুন্তলা দেবী হেসে বলেন, 'ও, আপনাকে বলা হয়নি। গত বছর কালবৈশাখীর ঝড়ে আমার মাথায় একটা আস্ত গাছ ভেঙে পড়েছিল। আমি দু-দিন অজ্ঞান ছিলাম। এখন এমনি কোনও অসুবিধে নেই। মাঝে-মাঝে মাথাটা ধরে যায়।'

অর্ণব হঠাৎই জিগ্যেস করে, 'আপনার বাড়িতে কে-কে আছে—আপনার স্বামী ছাড়া?'

শকুন্তলা দেবী হাসতে-হাসতে বলেন, 'শুনবেন, আশ্চর্য হবেন না। দুটো ময়ূর, চারটে রাজহাঁস, দুটো বনবিড়াল, একটা চিতাবাঘ, দুটো শেয়াল।'

অর্ণব হাসতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে, 'এ তো দেখছি চিড়িয়াখানা।'

শকুন্তলা দেবী বলেন, 'তাই না, তাই বটে। সবই আমার স্বামীর এক্সপেরিমেন্টের জন্যে। এখন ওরা কেউ যেতেই চায় না। ফ্রি-তে খাওয়া, থাকা, তারপর আমার মতো একজন চাকরানি—বাইরে কোথায় পাবে?'

আমরা কথা বলতে-বলতে একসময় পৌঁছে গেলাম। বিশাল জায়গা নিয়ে বাড়ি। বাড়ি তো নয়, যেন দুর্গ। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

শকুন্তলা দেবী নিজেই গাড়ি থেকে নেমে চাবি দিয়ে প্রকাণ্ড গেট খুললেন। বিরাট একটা একতলা বাড়ি। সাদা রং। অন্তত দশ-বারোটা ঘর নিশ্চয়ই আছে।

শকুন্তলা দেবী বললেন, 'বাড়ির পেছনদিকটায় আমাদের পোষ্যরা থাকে। মাঝে-মাঝে এদিকেও চলে আসে। ওই দেখুন।'

আমরা দেখলাম, তিনটে রাজহাঁস হেলেদুলে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শকুন্তলা দেবীকে ওরা ঘিরে ধরে। উনি ওদের একটু আদর করেন। ওরাও একটু আদর খেয়ে এগিয়ে গেল সামনের জলাভূমিটার দিকে।

শকুন্তলা দেবী আমাদের নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকেন।

বিশাল ড্রয়িং রুম। আমরা বসলাম।

শকুন্তলা দেবী আমাদের বললেন, 'একটু কফি করি?'

অর্ণব বলল, 'না, না, তার চেয়ে চলুন আপনার স্বামীর কাছে যাই।'

শকুন্তলা দেবী বললেন, 'চলুন। ও জানে আপনারা আসছেন।'

আমি বললাম, 'কী করে?'

শকুন্তলা দেবী বলেন, 'আমি কাল ওকে বলেছিলাম যে, আপনাদের যেভাবেই হোক নিয়ে আসব।'

অর্ণব বলল, 'তাতে উনি কী বললেন?'

শকুন্তলা মুখ বেঁকিয়ে বলেন, 'কী আর বলবে—চুপ করে শুনল। এমনিই ও একটু কম কথার মানুষ।'

আমরা বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। সুন্দর পরিচ্ছন্ন রুচির ছোঁয়া সারা বাড়ি জুড়ে।

আমরা একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'এই আমাদের বেডরুম। চলুন—' বলে শকুন্তলা দেবী দরজাটা ঠেলে ঢুকলেন —পেছনে আমরা।

ঘরটা আলোছায়ায় ঘেরা। ঘরে তেমন আসবাবপত্র নেই। একটা বড় খাট। যেটা সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে—বিছানায় টান-টান করে সাদা চাদর পাতা। পাশাপাশি দুটো বালিশ। পাশে একটা কোলবালিশ।

কিন্তু ঘরটা খালি।

শকুন্তলা দেবী বলেন, 'দেখছেন, এই হল সমস্যা। কিছুতেই খাটে শোবে না। দেখুন, খাটের নীচে ঢুকে বসে আছে। কই গো, বেরোও—ওনারা এসেছেন। এসো, বাইরে এসো।'

কয়েকবার ডাকার পর যেটা খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল তার একটা পা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেকল দিয়ে খাটের নীচে কিছুর সঙ্গে বাঁধা। আমরা প্রবল আতঙ্কে ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়ে ড্রয়িংরুমে এসে দাঁড়ালাম।

অর্ণব হাঁপাচ্ছে। অসুস্থ রোগীর মতো শকুন্তলা দেবী আমাদের পেছন-পেছন চলে এসেছেন, 'কী ব্যাপার, আপনারা পালিয়ে এলেন কেন?'

অর্ণব চাপা স্বরে বলে, 'এ রসিকতার কী মানে! ওটা কী?'

শকুন্তলা দেবী কাতর গলায় বলেন, 'আমার স্বামী! রজত বাসু।'

অর্ণব চিৎকার করে, 'ওটা একটা আঠেরো ফুট লম্বা কুমির।'

শকুন্তলা দেবী শান্ত গলায় বলেন, 'ও-ই তো আমার স্বামী। আপনাকে তো বলেছি।'

অর্ণব নিজের মাথায় চুল খামচে ধরে বলে, 'একটা আস্ত কুমির কী করে আপনার স্বামী হয়?'

শকুন্তলা দেবী শান্ত গলায় বলেন, 'ও তো কুমিরের টোটেম ব্যবহার করছে।'

অর্ণব বলে, 'টোটেম আর জ্যান্ত কুমিরের পার্থক্য বুঝি না আমি? আমায় কি বোকা ভাবেন?'

অর্ণব আমার হাত ধরে হনহন করে গেটের দিকে এগিয়ে চলল, যেখানে মোক্তার গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে।

শকুন্তলা দেবী আমাদের পেছন-পেছন আসছেন আর কথা বলছেন, 'না, না, বোকা কেন ভাবব? ড. সেন, আপনিই তো বলেছেন টোটেমিস্টরা টোটেমের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। আমার স্বামীর ক্ষেত্রে তা-ই হয়েছে। বিশ্বাস করুন, ও-ই আমার স্বামী—।'

আমরা ততক্ষণে গাড়িতে উঠে বসেছি। মোক্তার গাড়ি স্টার্ট করছে।

শকুন্তলা দেবীর দিকে তাকিয়ে এবার আমি বললাম, 'ওই কুমিরটার মধ্যে কোথায় আপনার স্বামীকে দেখতে পাচ্ছেন—কোথায় আপনার স্বামী?'

শকুন্তলা দেবী হতাশ গলায় বললেন, 'আছে, আমার স্বামী আছে। ওর পেটের মধ্যে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শকুন্তলা দেবীকে পেছনে রেখে আমাদের গাড়ি এগিয়ে গেল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

যখন সময় থমকে দাঁড়ায়

অবশেষে দিনটা এসেই গেল। এই ধরনের দিনগুলো এসেই যায়। চাইলেও আসে, না চাইলেও আসে। মৃত্যুর মতো অমোঘ, ঘৃণার মতো অনিবার্য। কী করা যাবে! তবুও তো জীবন চলে। লাটাইয়ের মাঞ্জা দেওয়া সুতোর আড়ালে অবলা সাদা সুতোর মতো যতক্ষণ না শেষ হয়। ধূলিধুসর আকাশের দিকে তাকিয়ে টাম লাইনের পাশে একখাবলা ঘেসো জমির ওপর দাঁড়িয়ে মৈত্রমশাই এই কথাগুলোই ভাবছিলেন। এবার নিজের মনে বিড়বিড়ও করে উঠলেন, 'অবশেষে দিনটা এসেই গেল।' একটু থেমে আবার বিড়বিড় করলেন, 'চলেও গেল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

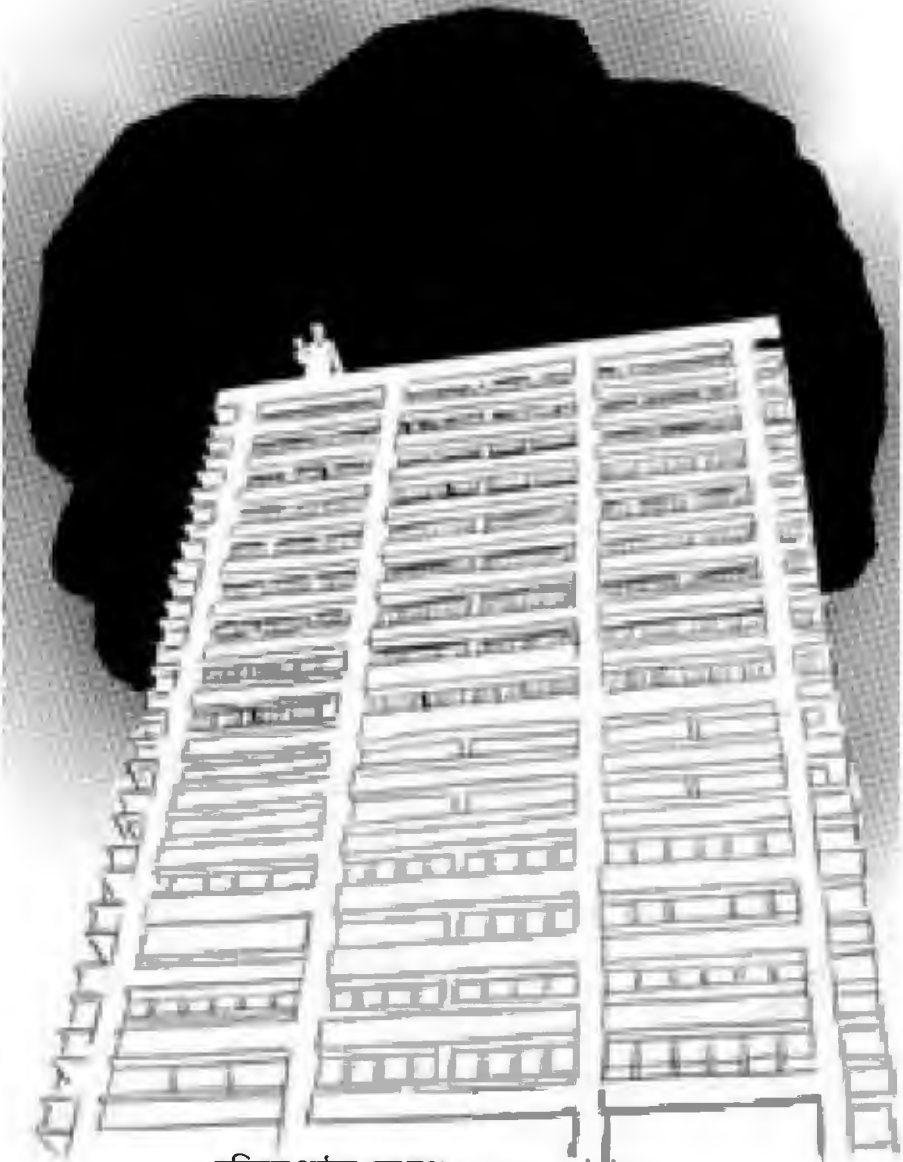

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অফিসফেরতা মানুষের ভিড় বাড়ছে, আকাশে এখনও পর্যাপ্ত আলো। শহরের নাম কলকাতা।

আসলে একটু আগেই মৈত্রমশাই, অর্থাৎ অমল মৈত্রর কর্মজীবনে যবনিকাপাত হল। সেটা বরং বেশ ঘটা করেই হল। অফিসের জনা তিরিশেক কর্মচারী এবং স্বয়ং বড়বাবুও বেশ খাতির করে ওনাকে ফেয়ারওয়েল দিলেন। সবাই তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের কর্মযোগকে সাধুবাদ দিলেন। কেউ-কেউ আবার একটু অতিশয়োক্তি করে ফেললেন। বক্তৃণতার শেষের দিকে বড়বাবুর গলা ধরে গেল। সামনে বসা বেশ কয়েকজন চোখ মুছলেন এবং অবশেষে একটি বড় ফুলের মালা আর এক বাক্স মিষ্টি মৈত্রমশায়ের হাতে ধরিয়ে যে-যার গন্তব্যে পা বাড়ালেন।

তখন থেকেই ওঁর রিটায়ার্ড লাইফ শুরু। প্রায় একঘণ্টা হয়ে গেল উনি বাড়ি না ফিরে আস্তে-আস্তে পার্ক স্ট্রিটের দিকে এগিয়ে চলেছেন। জীবন তো এই রকমই! একজন যায়, আর-একজন আসে। ওঁর বদলে অন্য কেউ আসবেন ওঁর ছেড়ে যাওয়া চেয়ারটা দখল করতে। যেমন উনি এসেছিলেন হালদারবাবুর বদলে।

এসব কথাই নিজেকে বোঝাচ্ছিলেন মৈত্রমশাই। ত্রিশ-বত্রিশ বছর ধরে চাকরি করছেন, ছাপোষা জীবনও কাটিয়ে ফেললেন। সোদপুরে একটি বাড়িও বানিয়েছেন। মেয়ের বিয়েও দিয়ে দিয়েছেন। স্ত্রী আছেন ধর্ম-কর্ম নিয়ে। আর উনি ছিলেন এই চাকরিটাই নিয়ে। এনটারটেইনমেন্ট বলে কিছুই ছিল না। সকাল আটটায় বেরোতেন, রাত আটটায় ঢুকতেন। আর ফি বছরে ছুটিতে বেড়াতে যেতেন একটাই জায়গা—পুরী। শেষের দিকে মৈত্রশায়ের মনে হত, উনি এতবার জগন্নাথের মুখ দেখেছেন, পরে একসময় মনে হত মৈত্রবাবুর মুখ দেখতে জগন্নাথের যথেষ্ট বিরক্ত লাগত। শেষের দিকে মনে হত ওঁকে দেখে জগন্নাথের যেন ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে। উনি কানে শুনতে পেতেন যেন বলরাম বলছেন, 'ফির তুম? ভাগো হিয়াঁসে।'

তারপরও উনি পুরীতেই যেতেন মনোকষ্ট নিয়ে। কারণ সিকিওরিটি। দীর্ঘদিন ধরে চৌধুরী লজে আস্তানা গাড়তে-গাড়তে লজটা এবং তার মানুষজন ওঁর কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সড়োগড়ো হয়ে গেছে। মানে, জায়গাটা ওঁর সেফ লাগে। অনেকেই পালটা বলতে পারেন যে, উনি একটা কূপমণ্ডূক। একই জায়গার বাইরে বেরোতে ভয় পান। কিন্তু যে যাই বলুক উনি পুরী ছাড়বেন না। কারণ, পুরী মানেই চৌধুরী লজ, আর চৌধুরী লজ মানেই জানাশোনা, এক কথায় নিরাপত্তা, সেফটি।

কিন্তু আজ ওঁকে দেখে কে বলবে যে উনি জীবনে ঝুঁকি নেননি! আজ অফিস থেকে যখন বেরোচ্ছেন, তখন পিওন হরিশ বলেছিল, 'স্যার, একটা ট্যাক্সি ডেকে দি?'

মৈত্রবাবু উদাস দার্শনিকের মতো বলেছিলেন, 'নাঃ। আজ একটু পায়ে হেঁটে শহরটাকে দেখব। প্রায় বত্রিশটা বছর অফিসের এই ঘুপচি ঘরটার মধ্যেই কাটিয়ে দিলাম। বাইরে যে এমন একটা শহর আছে, তা তো দেখাই হল না! আজ একটু দেখি। টাম লাইনটা ধরে একটু হাঁটি। ওই যে উঁচু বাড়িটা, ওটার ছাদ থেকে শহরটাকে একটু দেখতে ইচ্ছে করছে। ওপর থেকে দেখাটাকে কী বলে জানো হরিশ, "বার্ডস্ আই ভিউ।" সারাজীবন তো অফিসের ফাইলগুলো অর্জুনের "বার্ডস্ আই" ভেবে দেখে গেলাম। আজ নিজে বার্ড হতে চললাম।'

নিজের রসিকতায় নিজেই বেশ মজা পেলেন। হরিশকে সেটা বুঝতে না দিয়ে উনি মহানিষ্ক্রমণের পথে যাওয়ার মতো পথে পা বাড়িয়ে দিলেন। বেশ বুঝতে পারলেন যে, হরিশ, ওঁর পিছনে এমনভাবে তাকিয়ে আছে এবং তার চলে যাওয়া অবলোকন করছে, যেন হাজার-হাজার বছর আগের চিনের কোনও এক নাগরিক ভোর রাতে হিউয়েন সাঙকে ভারতের পথে এগিয়ে যেতে দেখেছিল। সেই ছিল একমাত্র সাক্ষী সেই পরিব্রাজকের পরিভ্রমণের।

উনি বেশ নাটকীয়ভাবে বড় রাস্তা পার হলেন। কিন্তু, আর-একটু হলেই ধুতিতে পা জড়িয়ে যেত। উনি ম্যানেজ করে নিলেন। কারণ একটাই, হরিশ ওঁকে দেখছে। উনি বিবেকানন্দের কথায় 'পৃথিবীতে দাগ রেখে যেতে' চাইছেন—প্রথম দাগিই হরিশ যার বুকে উনি দাগ রেখে গেলেন। বুঝিয়ে দিলেন বত্রিশ বছরের জীর্ণ কেরানির আলখাল্লাটা উনি পরিত্যাগ করলেন, হরিশ এবং অফিসের মুখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ উনি মুক্ত। মুক্ত জীবনানন্দ। কিন্তু মুশকিল হল, উনি জীবনানন্দের কোনও কবিতাই জানেন না। উনি একটি গানই জানেন, 'মালা বদল হবে এ রাতে'। ওইটি বিড়বিড় করতে-করতে জনারণ্যে হারিয়ে গেলেন। কিন্তু উনি জানেন, যে-গানই গান না কেন হরিশ কিন্তু ভাবছে—মৈত্রবাবুকে হিউয়েন সাঙ বলছেন—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।'

এখন মৈত্রমশাই পার্ক স্ট্রিটের সেই সবচেয়ে উঁচু বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে।

এমন সময় ফোন বেজে উঠল। সেলফোন। সেলুলার জেলে নাকি সেল থাকত। যে-সেলে একবার কেউ ঢুকলে ফেল না হয়ে বেরোত না। এটা ইংরেজদের অহংকার ছিল। উল্লাসকর দত্ত পাগল হয়ে বেরিয়েছিলেন—ফেল। বিপ্লবী অরবিন্দ রামদেব হয়ে বেরোলেন—ফেল—না এটা হয়তো ফেল নয়। যাই হোক, সেলফোন বেজে উঠল। মৈত্রবাবুর সব সেল কেঁপে উঠল। ফোনটা তুলে নম্বর দেখে বুঝলেন সেল এবং বোন কাঁপানো মহিলা ওঁর স্ত্রী।

একটু সময় নিলেন, স্ক্রিপ্টটা সাজিয়ে নিলেন—'হ্যালো—কোথায় তুমি?'

চোখ তুলে তাকাও সর্বত্র আমি—আ মরণ—মরণ তো দেখেছি গিন্নি তোমারই চোখে—মিনসে শুধু মরণই দেখলে?—না গো না, জীবনও দেখেছি। সেই জীবনের আনন্দেই তো আজ আমি মুক্ত জীবনানন্দ—সে আবার কে?—ওই যে যিনি লিখেছিলেন, 'মালা বদল হবে এ রাতে।' স্ক্রিপ্টটাসাজাতে-সাজাতেই ফোনটা কেটে গেল।

এবার মৈত্রমশাই ভাবলেন, কল ব্যাক না করলে সমূহ বিপদ। উনি ফোনের বোতাম টিপে দিলেন। ওপাশের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'হরিশ তো বলল চারটের সময় বেরিয়েছ।'

মৈত্র মশাই বড় মিহি করে বললেন, 'আসছি গো, আসছি।' ছোটবেলার নাটকের রেবেকার ভূমিকায় মিহিরদার মতো।

ওদিকের কণ্ঠস্বর ক্রমশ তীক্ষ্ন হল, 'নেশাভাঙ করেছ নাকি?'

মৈত্রমশাই রেবেকারূপী মিহিরদার মতো বললেন, 'কেন? কী হল?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপারে কণ্ঠস্বর বোধহয় স্তব্ধতা চেয়ে নিল সময়ের কাছে।

'না...কোনওদিন তো কথা বলোনি এমন সুরে আমার সঙ্গে।'

মৈত্রমশাই রেবেকারূপী মিহিরদাকে ছেড়ে ছোটবেলার অমল মৈত্রের মতো বললেন, 'না গো গিন্নি, ভয় পেয়ো না—আসলে আজ এত বছর পর নিজেকে রেক্টিফাই করছি। ও হো হো, মানে, সংশোধন করতে চলেছি। ভাবলাম, যার কাছে সংশোধন করা সবথেকে বেশি প্রয়োজন সে হচ্ছ তুমি। কারণ, আজকে এই আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে মুক্ত জীবনানন্দ হয়ে, যার রোজ সকাল ছ'টায় উঠতে হয়, যার রাত সাড়ে দশটার মধ্যে ঢুকতে হয়, অফিস শুরু হয় দশটায় শেষ হয় পাঁচটায়। তিন তিন ছ'ঘণ্টা যানবাহনে। সেই লোকটা যখন মুক্ত হয়, অথচ সে মুক্ত নয় দায়িত্বের কাছে, কর্তব্যের কাছে, তখন তার বাড়ি ফিরতে একটু সময় লাগে। ওপাশের কণ্ঠস্বর, 'না, না। ঠিক আছে। না হয় একটু দেরিতেই এসো। কিন্তু আমার কাছে তোমার কীসের সংশোধন?'

মৈত্রমশাই একটু হেসে স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি কি কোনওদিন জেনেছ আমি একজন ম্যাজিশিয়ান ছিলাম? অভয় ধরের ম্যাজিক দেখে আমি তার কাছে চলে গেছিলাম। এক বছর তার কাছে ম্যাজিক শিখেছি সেকি তুমি জানতে? তারপরে আরও কত বছর গোটা বিষয়টাকে আয়ত্ত করতে কত লোকের কাছে গেছি। কত লোককে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়েছি। তখন আমার আঠারো, কে যেন বলেছিল "আঠারো বছর জানে না..." তুমি তো এসেছ অনেক পরে। তখন আমি একজন ত্রিশঙ্কু কেরানি। যে শুধু জানে অফিসের ফাইল, ব্যাঙ্কের ই.এম.আই. আর পরিবারের নিরাপত্তা।'

ওপাশের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আমার ওটাই ভালো লাগে।'

মৈত্রমশাই বললেন, 'মিছে কথা বোলো না। ওটা আসলে অভ্যেস—আমার হ্যাঁ-তে হ্যাঁ মেলানো। আমি সারাজীবন তোমাকে ইয়েস ম্যান-ই ভেবে এসেছি। তুমিও আমার ইয়েস-এ ইয়েস-ই বলেছ, আজ অন্তত ইয়েস বোলো না। আজ অন্তত নো বলো। আসলে জীবন আমাকে সারাজীবন নো বলেই গেছে। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার থেকে ইয়েস শুনতে ভালো লাগত—আজকে ইয়েস বোলো না। নো বলো। আজ আমি মুক্ত, খোলা আকাশের নীচে আমার যা করণীয় ছিল, যা দায়িত্ব ছিল সব এক-এক করে পূর্ণ করেছি। আজ আমি মুক্ত—স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ নিতে চলেছি। তুমি আমাকে নো বলো।'

ওপাশের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আমার ভীষণ ভয় করছে। তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি এসো তো!'

'কেন?'

'তোমাকে ভীষণ অচেনা লাগছে।'

মৈত্রমশাই হেসে ওঠেন, 'গিন্নি, এটাই আমি। আমি নিজেকে লুকিয়েছি তোমার এবং সবার কাছে। সবার কাছে সংশোধন সম্ভব নয়। হাতের পাঁচ তুমি—এবার বোঝা গেল, কেন তোমার কাছে সংশোধন চাইছি!'

ওপাশের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আমি সংশোধন চাই না, তোমাকেই চাই। তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি এসো।'

মৈত্রমশাই বললেন, 'বাড়ি!'

তারপর হঠাৎই ওঁর মনে পড়ে গেল, পাড়ার শুয়োরের বাচ্চা লোফারগুলো একটা গান চোঙায় বাজাত। উনি স্ত্রীকে বললেন, 'বাড়ি! তোমার বাড়ি আমার বাড়ি, আমার বাড়ি নেই!'

ওপাশের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ন হয়ে উঠল, 'কোনও না কোনও সমস্যা অবশ্যই হয়েছে। তোমার গলা শুনে বোঝা যাচ্ছে, তুমি নেশা করোনি। কিন্তু ভুলভাল কথা বলছ।'

মৈত্রমশাই অট্টস্বরে হেসে উঠলেন ঃ 'ভুলভাল! আমি যদি ভুলভাল হতাম গোটা বাড়িটাকে কি তুমি শ্মশান করতে পারতে? আই মিন, সেফভাবে কাটাতে পারতে? আমি বারবার পুরী গেলেই দোষ? তুমি যে গোটা বাড়িটাই পুরী বানিয়ে রেখেছ। তোমার নিঝুম্পুরী। যেখানে তুমিই বক্তা, সবাই শ্রোতা।' 'হ্যালো—হয়েছে। আজ আমিই বক্তা, সারা দুনিয়া শ্রোতা!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর হঠাৎ স্ত্রীকে বললেন, 'আমার ফোনের ব্যাটারি ফুরিয়ে এসেছে। রাতে দেখা হবে—'

মিথ্যেই বললেন। ব্যাটারিতে যথেষ্ট চার্জ ছিল। আসলে উনি ওই উঁচু বাড়িটার ছাদে ওঠার জন্য মরিয়া হয়ে আছেন। ওই বাড়িটা একটা অফিস। ততক্ষণে অফিসের সমস্ত লোক বিদায় নিয়েছে। লিফ্টম্যানটা চলে না যায়, মৈত্রবাবুর মনে এই আশঙ্কা কাজ করছে।

মৈত্রমশাই বাড়িটার মধ্যে ঢোকেন। লিফ্ট এবং লিফ্টম্যানের মুখোমুখি। সরাসরি লিফটম্যানকে বললেন, 'আজ আমার রিটায়ারমেন্ট হয়েছে। ওপর থেকে এই শহরটাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে ভাই, একটু ছাদে উঠতে দেবে?'

লিফ্টম্যান অবাক! বেড়ে আবদার তো! তারপর নানান গাঁইগুঁই—অবশেষে একশো টাকায় রফা হল।

লিফটম্যান বলল, 'আধঘণ্টার মধ্যে আমার ডিউটি শেষ, তার মধ্যে নামবেন। নইলে সারারাত গ্যারেজ।

মৈত্রমশাই বাধ্য ছেলের মতো মাথা নেড়ে লিফ্টে সেঁধিয়ে গেলেন।

ছাদে উঠে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল ওঁর মধ্যে। মনে হল, সমুদ্রের সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

এগিয়ে গেলেন বিশাল ছাদের পাঁচিলটার দিকে। পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকালেন। মাথাটা ঘুরে গেল।

ঠিক তখুনি দেখতে পেলেন, ছাদের অপরদিক থেকে একটি ছেলে এগিয়ে আসছে। পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি, কাঁধে একটা চটের ব্যাগ।

ছেলেটা এগিয়ে আসছে মৈত্রমশাইয়ের দিকে। ওর হাতে একটা সিগারেটের প্যাকেট। মৈত্রমশাইকে বলল, 'দিন, দেশলাইটা দিন।'

মৈত্রমশাই একটু হকচকিয়ে গেলেন। একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'আমি তো সিগারেট খাই না।'

ছেলেটা ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে বলল, 'খান না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৈত্রমশাই বললেন, 'না, মানে বছর পনেরো হল ছেড়ে দিয়েছি।'

ছেলেটা বলল, 'তাই বলুন—।'

তারপর মৈত্রবাবু বললেন, 'দাঁড়াও দেখছি! লোডশেডিং-এর ভয়ে গিন্নি আমার ব্যাগে দেশলাই ভরে দেন।'

ব্যাগ হাতড়ে দেশলাই বের করে ছেলেটির হাতে দেন। ছেলেটি সিগারেট ধরায়। ধোঁয়া ছাড়ে।

মৈত্রমশাই বললেন, 'সিগারেটের গন্ধে পুরোনো স্মৃতিটা উসকে উঠল। দাও, একটা খাই।'

মৈত্রবাবু সিগারেটে টান দিয়ে খকখক করে কাশতে শুরু করেন। বহুদিনের অনভ্যাস।

ছেলেটা বলে উঠল, 'দেখবেন, দেখবেন। এক্ষুনি দম আটকে যাবে।'

মৈত্রবাবু একটু হাসলেন, 'বহুদিন বাদে সিগারেটে টান দিয়ে আমার মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছিল। কেমন একটা ঘোর এসে গেল।'

এই ঘনঘোর অবস্থায় ছেলেটিকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নাম কী?'

ছেলেটি বলল, 'অমল।'

মৈত্রবাবু বলে উঠলেন, 'অমল! বাঃ, বেশ কমন নাম। নিবাস কোথায়, আদি নিবাস?'

ছেলেটি বলল, 'বরিশাল।'

'বরিশাল! অদ্ভুত, আমিও তো বরিশালের লোক। যদিও বরিশাল কখনও দেখা হয়নি। তুমিও তো দেখোনি। তোমার দেখার কথাও নয়।'

ছেলেটি বলল, 'না, আমিও দেখিনি। শুনেছি বাবা-মার মুখে।'

মৈত্রমশাই বললেন, 'আমারও তাই।' তারপর পাঁচিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে নীচের দিকে তাকালেন। নীচে জনরণ্য দেখতে-দেখতে বললেন, 'ওপর থেকে শহরটাকে একবার দেখো, কেমন লাগে। সত্যি যদি এক জোড়া ডানা থাকত।' তারপর ছেলেটিকে বললেন, 'রাইট ব্রাদার্সরা নিজেদের শরীরে ডানা লাগিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওড়ার চেষ্টা করেছিল।'

ছেলেটি ওঁর মতোই পাঁচিলের ওপর থেকে জনরণ্য দেখতে-দেখতে বলল, 'আপনি দয়া করে ওড়ার চেষ্টা করবেন না। নাহলে আপনি রাইট নন, রং ব্রাদার্সের মধ্যে পড়বেন।'

মৈত্রবাবু ঘাড় নাড়তে-নাড়তে বললেন, 'রসিকতা! সবুজ রসিকতা। তোমার মতো বয়েসে আমারও এমন রসিকতাবোধ ছিল। কিন্তু সংসার যে কীভাবে সব গ্রাস করে নিল...।'

ছেলেটি অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি তো এটাই চেয়েছিলেন। আপনার মতো লোকেরা তো এটাই চায়-তাই তো? থোড় বড়ি খাড়া, আর খাড়াবড়ি থোড়।'

মৈত্রমশাই ফুটে ওঠা তারা দেখতে-দেখতে বললেন, 'বোর! বোর!' তারপর ছেলেটিকে জরিপ করে বললেন, 'কী করা হয়? বয়স কত?'

ছেলেটি বলল, 'পঁচিশ। ছাত্র ছিলাম, এখন এই চত্তরটাতেই ঘুরে বেড়াই।'

মৈত্রমশাই জিগ্যেস করলেন, 'বাবা কী করেন?'

ছেলেটি বলে, 'ওকালতি।'

মৈত্রমশাই বললেন, 'ও বাববা! ওকালতি? সে তো আমার বাবাও করতেন। খুব রাশভারী লোক ছিলেন, বুঝলে? নিজের বাবা বলে বলছি না—ওনার চোখের দিকে তাকিয়ে কথাই বলা যেত না।'

ছেলেটি বলল, 'কেন? কী ছিল চোখে?'

মৈত্রমশাই ফিক করে হেসে বললেন, 'ঘুম। সারাক্ষণ ঘুমিয়ে থাকলে কথা বলব কী করে চোখের দিকে তাকিয়ে? বাড়িতে যতক্ষণ থাকতেন খালি ঘুমোতেন।'

ছেলেটি সামনে পেছনে মাথা দোলাতে-দোলাতে বলল,'রসিকতা! সবুজ রসিকতা!'

মৈত্রবাবু ও ছেলেটি দুজনেই হাসতে শুরু করে। মৈত্রমশাই ছেলেটিকে বললেন, 'পান খাবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেটি বলে, 'এটা আবার কবে ধরলেন?'

মৈত্রমশাই বললেন, 'তা বছর দশেক হল।'

ছেলেটা পান চিবোতে-চিবোতে বলল, 'কখনও ভেবে দেখেছেন যে, পান চিবোতে-চিবোতে যুক্তাক্ষর বলা যায় না!'

মৈত্রবাবু বললেন, 'তাই তো!'

তারপর দু-তিন বার 'কুঞ্জাভিসার' বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তখন ছেলেটি বলল, 'আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম, তখন কিন্তু পারিনি।'

ছেলেটিকে বললেন, 'জানো আমিও একবার এটা ভেবেছিলাম।' ছেলেটি বলল, 'কবে ভেবেছিলেন এটা মনে পড়ছে না, তাই তো? বয়েসে এইরকমই হয়। বয়সটা এমনই জিনিস।'

মৈত্রবাবু একটু বিমর্ষ হয়ে ছেলেটিকে বললেন, 'তুমি আমায় বয়েসের খোঁটা দিলে? জানো, "বয়েস একটা সংখ্যা মোটেও নয়কো টংকা/ পকেটে তো রাখা যায় না।" '

একটা সুপুরি গলায় চলে গিয়েছিল। মৈত্রমশাই ঢোঁক গিলতে যতটা সময় নিলেন। ততক্ষণে ছেলেটা বলতে শুরু করল, 'বয়স আসলে জ্ঞান/ পাকাচুল অভিধান/ ফিতে দিয়ে মাপা যায় না।'

মৈত্রমশাইয়ের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। ওঁর কথা জড়িয়ে গেল। জড়ানো গলায় বললেন, 'তুমি এটা কী করে জানলে? আমার বাবা তো এটা বলতেন।'

ছেলেটা একদৃষ্টে মৈত্রমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক! আমি কী করে জানলাম? আট বছর বয়সে আপনি ঠাকুমার সিন্দুকে আটকে গেছিলেন। কী? ঠিক তো?'

মৈত্রমশায়ের মুখ সাদা হয়ে গেল। বললেন, 'তুমি কে?'

বললাম তো, অমল।'

'অমল কী?—'

'মৈত্র—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বাবার নাম?'

'মানবেন্দ্র মৈত্র।'

মৈত্রবাবু রাগে ফেটে পড়েন, 'তুমি কি ইয়ার্কি মারছ?'

ছেলেটা শান্তভাবে বলে, 'ইয়ার্কি নয়। আমাকে একটু ভালো করে লক্ষ করে দেখুন তো।'

মৈত্রমশাই যেন মুখের কথা ফিরে পেলেন, 'হ্যাঁ, তোমাকে বেশ চেনা-চেনা লাগছে।'

'লাগারই তো কথা।' ছেলেটা বলে। আরও বলে, 'পঁয়ত্রিশ বছর আগে ঠিক এরকম দেখতে ছিলেন আপনি। আর আজকে আপনি নিছক আকাশ দেখেবেন বলে বাড়িতে ওঠেননি। আপনার লুকোনো ইচ্ছে আপনাকে এখানে টেনে এনেছে। আপনি এর আগেও এখানে এসেছিলেন, মনে করুন?'

মৈত্রবাবু চোখ কুঁচকে ভাবতে থাকেন। বলেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই তো, এসেছিলাম। কিন্তু কেন বলো তো?'

ছেলেটি বলে, 'আপনিই মনে করুন। ঠিক এভাবেই আজকের মতো লিফ্টম্যানকে ঘুষ দিয়ে এখানে এসেছিলেন।'

মৈত্রবাবুর মাথায় বিদ্যুৎচমকের মতো ঝিলিক দিয়ে গেল। তারপর বললেন, 'এগজ্যাক্টলি। মালতী!'

ছেলেটি বলে, 'রাইট! আপনার মালতীর সেদিন বিয়ে ছিল। সেদিন আপনি উদ্ভ্রান্তের মতো পাগল হয়ে এই ছাদে উঠেছিলেন নীচে লাফ দেবেন বলে। আপনি ওই কার্নিশটার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঠিক তখনই নীচে রাজপথে বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনকারীরা পুলিশের গাড়িতে বোমা ছোড়ে। সেই শব্দে আপনার সংবিত ফিরে আসে। আপনার মাইন্ড চেঞ্জ হয়ে যায়। আপনি আর লাফালেন না। ফিরে গেলেন।'

মৈত্রবাবু অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, 'তুমি কী করে জানলে?'

এবার ছেলেটা উত্তেজিত হয়ে হাত ঝাঁকিয়ে বলে, 'ভালো করে তাকিয়ে দেখুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমলবাবু, আমি পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার আপনি। আমি সেই মুহূর্তটা যাকে এই এখান থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। আমিই সেইমুহূর্তটা। আপনি তো ফিরে গেলেন—আর আমি আটকে রইলাম সেই টাইম ফ্রেমে।'

মৈত্রমশাইয়ের মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। কিছুই বুঝতে পারছেন না। হাত নাড়িয়ে বললেন, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। বুঝতে পারছি না—মানে, তুমি...আমি! আমি...তুমি! কী করে হয়?'

ছেলেটা চোখ বন্ধ করে বুক ভরতি নিশ্বাস নেয়। তারপর বলে, 'আপনি এখানে দাঁড়িয়েছিলেন। ঠিক নীচের দিকে তাকাচ্ছিলেন। আপনি মনে-মনে ঠিক করে নিয়েছেন, আপনি ঝাঁপ দিচ্ছেন। আপনার কানের পাশ দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, রাস্তাটা উঠে আসছে, এই বাড়ির জানলাগুলো সরে যাচ্ছে দ্রুত। ঝাঁপ দেওয়ার আগে আপনি এগুলো ফিল করেছিলেন কি না বলুন?'

মৈত্রবাবু মন্ত্রমুগ্দের মতো বললেন, 'হ্যাঁ, করছিলাম। করছিলামই তো।'

ছেলেটা এবার নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'এগ্‌জ্যাক্টলি। আপনার জীবনের ওই মুহূর্তটাই হচ্ছি আমি। আমি পড়েই গেলাম। আপনি ফিরে গেলেন। আমি আটকে রইলাম ওই টাইম ডাইমেনশনে। হত্যাকারী নাকি হত্যার জায়গায় ফিরে আসে। অপরাধ-বিজ্ঞান এ কথা বলে। আমিও অপেক্ষা করতাম—কবে আপনি ফিরে আসবেন। আর সেই কবিতাটা আওড়াতাম, 'তেত্রিশ বছর কাটল। কেউ কথা রাখেনি, কেউ কথা রাখেনি...'। যদিও তেত্রিশ নয়, পঁয়ত্রিশ বছর কাটিয়ে দিলেন আপনি। এবার তো কথা রাখুন!'

মৈত্রমশাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, 'কী কথা?'

ছেলেটা খানিকক্ষণ নিশ্বাস চেপে মৈত্রমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দু-হাতে তালি দিয়ে বলল, 'আসুন, এবার আপনাকে বোঝাচ্ছি। ওই দেখুন—' বলে ছেলেটা নীচের দিকে ইশারা করে বলল, 'ওই দেখুন, আমি আটকে আছি।'

মৈত্রমশাই পাঁচিলে ঝুঁকে নীচে দেখার চেষ্টা করছিলেন। ঠিক তখনই তিনি অনুভব করলেন ছেলেটি তাঁকে এক ধাক্কা মেরে ফেলে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৈত্রমশাইয়ের শরীরটা ডিগবাজি খেতে-খেতে মাধ্যাকর্ষণের টানে রাজপথের দিকে পড়তে লাগল। একটা শব্দ—বহুলোকের কণ্ঠস্বর আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

মৈত্রমশাইয়ের দেহটা যেখানে পড়েছে সেখানে তাঁকে ঘিরে বহুমানুষের একটা বৃত্ত তৈরি হল।

ছেলেটা ছাদ থেকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

ছেলেটা পাঁচিলে ঝুঁকে পড়ে দেখছিল বলে বুঝতে পারেনি পিছনে একজন এসে দাঁড়িয়ে আছে।

মৈত্রমশাই ছেলেটার কাঁধে হাত রাখলেন।

ছেলেটা ঘুরে তাকাল। হেসে বলল, 'বলুন অমলবাবু!'

ব্যাজার মুখে মৈত্রমশাই বললেন, 'দাও, আরও একটা সিগারেটই খাই।' একবুক ধোঁয়া টেনে নিয়ে বললেন, 'কী, এবার তো শান্তি! এরপরেও বলবে—কেউ কথা রাখেনি।'

তারপর দুজনেই হাসতে লাগলেন।

ওদের এই হাসির আওয়াজ কেউ শুনতে পাচ্ছিল কি না জানি না। তবে একটা কথা নিশ্চিত জানি, ওদের এই হাসির আওয়াজ ফোর্থ ডাইমেনশনে রেকর্ড করা ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

ইতি হত

অন্ধকার মাঠের একটা পাশে একটা কাঠের বেঞ্চ, দূরে আমাদের হাউজিং এস্টেটের বাড়িগুলো ল্যাম্পপোস্টের খয়াটে আলোর চাদরে কেমন ভূতুড়ে। শীতকালের ঠান্ডা বাতাস বাড়িগুলোর জানলাগুলোকে বন্ধ রাখার কড়া নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। বাড়িগুলোর জানলা দিয়ে তাই কোনো আলোই বাইরে আসতে পারছে না। গোটা পাড়াটাই ল্যাম্পপোস্টের খয়াটে আলোর শাসনে।

মাঠের পাশের কাঠের বেঞ্চটাতে আমরা চারজন—আমি, রাজা, অনিন্দ্য, চন্দন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত বাড়ছে। আমাদের আড্ডার মতন। রাতের ঠান্ডা বাতাস বাধ্য করছে আমাদের গায়ের চাদরগুলো জাপটে ধরতে। একটা অদ্ভুত কুয়াশার রেখা বেমানানভাবে মাঠের মাথার ওপর ঝুলে রয়েছে, যেন যে-কোনো মুহূর্তে মাঠটার ওপর ভেঙে পড়বে।

আমাদের সেদিকে নজর ছিল না। আমরা ব্যস্ত ছিলাম নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া মানুষদের বিষয়ে।

আসলে আমাদের পাড়ার হরেনবাবু গত ছমাস ধরে নিখোঁজ। হরেনবাবুর বয়েস আটষট্টি বছর। ওনার একমাত্র ছেলে দিল্লিতে চাকরি করে। স্ত্রী অসুস্থ। এমন অবস্থায় একদিন হরেনবাবু বাজার করতে বেরিয়ে আর ফিরলেন না।

হরেনবাবুর নিখোঁজ হওয়া নিয়ে অনেক জলঘোলা হল। থানা, পুলিশ সবই। কিন্তু, কিছুই হল না। হরেনবাবুকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

কেউ বলল, 'সাধু হয়ে গেছেন।'

কেউ বলল, 'পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন।' কেউ বলল, 'আত্মহত্যা করেছেন বা মারা গেছেন দুর্ঘটনায়।'

কিন্তু সবটাই অনুমান।

এ ঘটনা ছ'মাস আগেকার। আজকে আমাদের আড্ডায় হরেনবাবুর অনুপ্রবেশ অন্য কারণে। আজ হরেনবাবুর অসুস্থ স্ত্রী মারা গেছেন।

সবাই শোকস্তব্ধ। ওনাদের ছেলে দিল্লি থেকে চলে এসেছে। পাড়ার সবাই তাকে সমস্ত রকম সাহায্য ও সান্ত্বনা প্রদান করছেন।

হরেনবাবুর তিন কুলে কেউ নেই, তাই ওনার দিক থেকে কেউই আসেনি। খালি ওনার স্ত্রীর এক দূরসম্পর্কের মামা এসেছিলেন, লোকবল প্রায় নেই বলেই পাড়ার সবাই এগিয়ে গেছিল এবং সব কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়ে গেছিল। এখন রাতের আড্ডায় তাই হরেনবাবু ঢুকে পড়েছেন।

চন্দন বলল, 'শুনেছি আমার এক দাদু এরকমই নিরুদ্দেশে চলে গেছিলেন।'

আমি বললাম, 'তারপর?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চন্দন বলল, 'সাত দিন বাদে ফিরে এসেছিলেন।'

আমরা হাসতে শুরু করলাম।

রাজা বলল, 'শোনা যায়, প্রতি বছর আমাদের দেশে ৬০০০ মানুষ হারিয়ে যায়, কিছু লোককে খুঁজে পাওয়া যায়, কিছু লোককে কোনোদিনই পাওয়া যায় না। সে লোকগুলো যায় কোথায়?'

অনিন্দ্য বলল, 'জোয়ান ছেলেরা সব বম্বে চলে যায় হিরো হতে, মেয়েরা হিরোইন নয় তো পাচার হয়ে যায়।'

রাজা বলল, 'না, না, সে তো না হয় হল, কিন্তু এই বুড়োগুলো কোথায় যায়?'

চন্দন বলল, 'হরদুয়ার বা লছমনঝুলা'।

আমি বললাম, 'হরেনবাবুকে তো সাধুসন্ত টাইপের লোক কখনো মনে হয়নি। একটু চুপচাপ থাকতেন। কিন্তু ন্মকর্ম নিয়ে কোনোদিন বাড়াবাড়ি করতে তো দেখিনি।

অনিন্দ্য বলল, 'ওইটাই তো সমস্যা। ন্ম যে কখন কী ভাবে কার মধ্যে সেঁধিয়ে যায় তা কে জানে!'

রাজা বলল, 'আসলে এই নিখোঁজ হয়ে যাওয়া বুড়োগুলো রাস্তায় পড়েই মরে যায়। এরা তো আর আধার কার্ড বা প্যান কার্ড নিয়ে পালায় না, তাই বেওয়ারিশ মড়া হয়ে মর্গে চলে যায়, তাই কেউ জানতে পারে না।'

আমি একটা কী বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় প্রায় মাঠের অন্ধকার ফুঁড়ে একজন আমাদের সামনে উদয় হলেন। ঘটাদা।

ঘটাদা কে বা কেন এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া অসম্ভব। ঘটাদার তুলনা করা যায় না। যদি বলেন, ঘটাদা অমুকের মতো, তা হলে, দেখা যাবে—অমুকটিকে আর খুঁজে পাচ্ছেন না। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ঘটাদা অমুক পদলোপী।

ঘটাদা ছায়াময়। কেউ বলে মহাজ্ঞানী, কেউ বলে মূর্খ, কেউ বলে দার্শনিক, কেউ বলে পুরো ভাট।

যাই হোক, সেই ঘটাদা চাদর-মুড়ি দিয়ে কুয়াশা ভেদ করে আমাদের সামনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদয় হলেন। হাতে একটা খালি তেলের শিশি, হয়তো দোকানে বেরিয়ে ছিলেন, মাঠে অন্ধকারের আড়ালে আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে, যেন আমাদের দর্শন দিতে এলেন।

'কী?' কী নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে যাঁ?'

আমরা ভূতের মতো ঘটাদার অনুপ্রবেশের ধাক্কা সামলে বললাম, 'হরেনবাবুর নিখোঁজ হওয়া।'

ঘটাদা বেঞ্চের সামনে ঘাসের ওপর বাবু হয়ে গ্যাঁট হয়ে বসলেন, তারপর বললেন, 'কে? হরেনদা? নাহ্, উনি আর ফিরবেন না।'

আমরা ঘটাদার এই ফুলস্টপ দেয়াটায় যথেষ্ট বিরক্ত হলাম।

চন্দন বলে উঠল, 'কেন? ফিরতেও তো পারেন।'

ঘটাদা রাজার থেকে একটা সিগারেট চেয়ে ধরালেন, তারপর উদাস গলায় বললেন, 'ওনার পক্ষে আর ফেরা সম্ভব নয়।'

আমরা অবাক। আমি বললাম, 'আজকে ওনার স্ত্রী মারা গেলেন, একথা যদি উনি জেনে থাকেন, তা হলে তো খুব অন্যায়। একবারও এলেন না?

চন্দন বলল, 'না, না, জানেন না', জানবেনই বা কী করে?'

ঘটাদা বললেন, 'ওনার স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন, এবং মৃত্যুর দোরগোড়ায় ছিলেন। এটা উনি জানতেন।'

রাজা বলল, 'এটা জেনেও তিনি চলে গেলেন? মৃত্যুর পর এলেনও না। কী বলছ ঘটাদা, এ তো নিষ্ঠুরতা!'

ঘটাদা দার্শনিকের মতো বলে উঠলেন, 'তা বলে সৈকত, "বারি বিন্দু সম-সুতমিত্র রমণী সমাজে।" একথা বিদ্যাপতি কী নিষ্ঠুর হয়ে লিখেছেন? আসলে প্রিয় মানুষদের বিচ্ছেদ কোনও মানুষের কাছেই কাম্য নয় রে, কাম্য নয়।

'অলিম্পিকের দৌড়ে যদি তুই দৌড়স্, সেই রেসে কেউ পেছনে পড়ে গেলে, সে তোর যতই বন্ধু হোক, তুই কি আর দাঁড়াতে পারবি? নিয়মের টানে তোকে এগিয়ে যেতেই হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের মাথা ঝিমঝিম করছিল। কিছুই বুঝতে পারছি না। ঘটাদা আমাদের অবস্থা বুঝে মিটিমিটি হাসছিলেন, এক সময় বললেন, 'বল তোদের কী কী প্রশ্ন আছে।'

আমরা মরিয়া হয়ে বললাম, 'তুমি এত সিওর হয়ে কী করে বলছ, উনি আর ফিরবেন না?'

ঘটাদা বললেন, 'ওনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, দেড় মাস আগে।'

আমরা বিস্ময়ে প্রশ্ন ছুড়লাম 'কোথায়?'

ঘটাদা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তা জেনে কী করবি? একটা নির্জন স্টেশনে। কলকাতার বাইরে, এক পড়ন্ত বিকেলে। হয়েছে, শান্তি?'

আমি বললাম, 'বেশ, বেশ আমরা কিছু প্রশ্ন করব না, তুমি বলো।'

অন্ধকারে মনে হল, ঘটাদা খুশি হলেন। ঘটাদা বললেন 'আসলে উনি এখন আর হরেন নেই, বরেন, বা হীরেন বা ধীরেন, বা মাইকেল, বা মসিয়া ভার্দু বলে চুপ করে যান।

তারপর হঠাৎ-ই বললেন, 'না, না, তোরা আগে সেরে নে। আমার গল্পটা বড়।'

আমাদের মধ্যে ঘটাদার প্রতি ঘোর অবিশ্বাসী রাজা বলে উঠল, 'সে তো বুঝেছি, তেলের দোকান বন্ধ। তাই হাতে সময় আছে।'

আমরা রে রে করে রাজাকে থামালাম, পাছে ঘটাদার মুড খারাপ হয়ে যায়। চন্দন বলে, 'তুমি বলো ঘটাদা, একটা কথা মানতে পারছি না—হরেনবাবু এত নিষ্ঠুর ছিলেন? ঘটাদা বললেন, 'বিদ্যাপতির ভাষায় বলি "যে মানুষের জীবন উত্তপ্ত বালির মতো, তার কাছে সম্পর্ক হল, উবে যাওয়া জলবিন্দু"।'

আমি একটু গাইগুঁই করে বললাম, 'এতই উত্তপ্ত জীবন যে স্ত্রীর মৃত্যুতেও পাশে থাকতে পারলেন না!'

ঘটাদা এবার একটা ঘাস ছিঁড়ে চিবোতে চিবোতে বললেন, 'এরকম ওনার হাজার খানেক বউ ছিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা আঁতকে উঠলাম, 'কী বলছ?'

ঘটাদা বলেন, 'হ্যাঁ এবং সম অনুপাতে সন্তান-সন্ততি।'

আমরা হাসতে শুরু করলাম।

রাজা বলে, 'তার মানে হরেনবাবু এক হপ্তা বাদে-বাদে বিয়ে করেছেন। নাহলে একহাজারে পৌঁছোলেন কী করে? তিরিশ বছর ধরে উনি ওখানে ছিলেন—একটি ছেলে ও একটি বউয়ের বেশি তো দেখিনি। আর উনি একজন কেরানি ছিলেন। খুব বাইরেও ট্যুর করতে যাননি যে বাইরে গিয়ে বিয়ের পর বিয়ে করে যাবেন।'

ঘটাদা এবার রেগে গেলেন। বললেন, 'আচ্ছা, তোরা হরেনবাবুর শরীরের বর্ণনা দে তো।'

চন্দন বলল, 'হরেনবাবু লম্বা ছিলেন, মাথাভর্তি ধবধবে সাদা চুল। আমরা যবে থেকে দেখছি, তবে থেকে ঝুঁকে হাঁটেন—একটা পা টেনে হাঁটতেন। শুনেছি আর্থারাইটিস্।'

ঘটাদার চোখ চকচক করে ওঠে। আর চামড়ার?

আমি বললাম, 'হ্যাঁ চামড়া ঝুলে পড়েনি আটষট্টি বছরের বুড়ো মানুষদের মতো।'

ঘটাদা হাসেন বিজয়ীর হাসি, 'তা হলে বল উত্তম কুমারও বুড়ো ছিলেন অগ্‌ণীশ্বরে সেকেন্ড হাফে।'

আমরা অবাক, 'মানে?'

ঘটাদা বলেন, 'মাথার চুল রং করে সাদা করা যায়, ঝুকে হাঁটাও রপ্ত করা যায়, আর্থারাইটিসের নাম করে পা টেনে টেনেও হাঁটা যায়।'

আমি বললাম, 'তার মানে তুমি বলছ হরেনবাবু অভিনয় করতেন?'

ঘটাদা বলেন, 'একজাক্টলি।'

চন্দন বলে, 'কেন, কেন উনি এমন করবেন? লোকে তো ইয়ং হতে চায়। চুল কালো করে।'

ঘটাদা বলেন, 'উনি এটা করতে বাধ্য ছিলেন। কারণ উনি দেখতে পাচ্ছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিরিশ বছর ধরে ওনার স্ত্রী বুড়ো হচ্ছে, ছেলে জোয়ান হয়ে পড়ছে, আশেপাশে সবার বয়েস বেড়ে চলেছে, আর উনি যৌবনেই রয়ে গেছেন।

রাজা বলে, 'এ কী করে সম্ভব?'

ঘটাদা এবার পা ছড়িয়ে দিলেন ঘাসের মধ্যে। বললেন, 'তা হলে শোন, হরেনবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হল এক নির্জন স্টেশনে। মাথায় মাঙ্কি টুপি পরে একটা বিচ্ছিন্ন বেঞ্চে বসেছিলেন। স্টেশনে কোনো লোক নেই। সময়টা বিকেল। আমায় দেখে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন পাছে চিনতে পারি। কিন্তু আমিও নাছোড়। মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

AMARBOI.COM

'কী ব্যাপার হরেনদা? আপনাকে সবাই গরু খোঁজা খুঁজছে, আর আপনি এখানে বসে রোদ পোয়াচ্ছেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হরেনবাবু আমার দিকে করুণভাবে তাকালেন। তাকিয়েই থাকলেন।

আমার মনে হল, উনি আমার দিকে নয়, সুদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছেন।

এক সময় বললেন, 'আর ফেরা যাবে না, আমার সময় শেষ তোমাদের সঙ্গে।'

আমি বললাম, 'কেন?'

উনি বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে ফিরে গেলে একদিন তোমরাই আমায় পাথর পিটিয়ে মারবে। অন্তত, মারার চেষ্টা করবে। আমি মরব না, কারণ আমার মৃত্যু নেই।'

আমি ধাঁধায় পড়ে গেলাম। কী এক যেন ছিল ওনার গলায়। যা শুনে আমার মনে হচ্ছিল উনি অন্তত পাগলামি করছেন না।

এবার হরেনবাবু বললেন, 'বসো ঘটা। তোমায় আমার কেন জানি না সেনসেটিভ মনে হয়। এখন আমি যা বলব তা বুদ্ধি দিয়ে নয়, বোধ দিয়ে উপলব্ধি করো। দেখবে সব ইঙ্গিত দেয়া আছে। অর্থাৎ এতদিন স্কুল-কলেজে যা শিখে এসেছ, তা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে যেও না, অন্তর্দৃষ্টির সাহায্য নাও, তা হলেই সত্যদর্শন হবে।'

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, আমার এরকম অবস্থা দেখে হরেনবাবু ম্লান হাসলেন। যে হাসিতে গভীরে বেদনা।

হরেনবাবু বললেন, 'ঘটা তুমি মৃত্যু দেখেছ?'

আমি বললাম 'দেখেছি।' উনি বললেন, 'হাজার হাজার বছর ধরে মৃত্যু দেখেছ?'

আমি বললাম, 'আমার যা বয়স, তাতে যা দেখার দেখেছি।'

উনি বললেন, 'আমি হাজার হাজার বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মৃত্যু দেখেছি।'

আমি বললাম, 'আপনার বয়েস কত?'

উনি বলেন, 'মনে হয় সাড়ে পাঁচ হাজারের কিছু বেশি।'

আমি বেঞ্চ থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম, সামলে নিলাম, 'মানে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনি বললেন, 'অবাক হোয়ো না। আজ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে —আমার শরীরে দুটো অপারেশন হয়। খুব উন্নত মানের শল্য চিকিৎসা। আমার শরীরে দুটো সফল এক্সপেরিমেন্ট করা হয়। একটায় আমার মাথার বা মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় সম্পদ আমার স্মৃতিকে ডিলিট করে দেয়া হয় আর একটায় আমার জেনেটিক বদল করা, যাতে আমার শরীরের কোনো কোষ নষ্ট না হয়ে যায়। অর্থাৎ আমার যেন মৃত্যু না হয়।

স্মৃতি, অভিজ্ঞতা। এসব ছাড়া আমি যাতে এই পৃথিবীতে হাজার হাজার বছর ভূতের মতো বেঁচে থাকি। এটাই ছিল আমার শাস্তি। উঃ ভগবান, এমন শাস্তি কেউ কাউকে দিতে পারে?

আমি বলি, 'আপনার অপরাধটা কী?'

হরেনবাবু একটু ইতস্তত করেন। বলেন, 'অপরাধটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে এমন প্রায়শই হয়। কিন্তু ওরা শাস্তি দিল।'

একটু চুপ করে বলেন, 'আসলে আমি ঘুমন্ত অবস্থায় কিছু শিশুকে হত্যা করি, আমি একা নয়—আমার সঙ্গে কয়েকজন ছিল। এবং সেটা যুদ্ধকালে নয়, গভীর রাতে। যখন সবাই গভীর ঘুমে।'

আরও একটা অপরাধ করেছিলাম, হ্যাঁ। সেটা মারাত্মক অপরাধ, আমি আমার পৈন্ক সূত্রে পৃথিবী ধবংস করার মতো একটা নিউক্লিয়ার বোমা পেয়েছিলাম। সেটা পাওয়ার আগে শপথও নিয়েছিলাম, এটার ব্যবহার করব না ব্যক্তিগত কারণে। কিন্তু আমি রাগে, হিংসায় সেটার ব্যবহার করে ফেলেছিলাম।

আমি আঁতকে উঠি, 'মানে, পৃথিবী তো ধবংস হয়নি।' হরেনবাবু করুণ ভাবে হাসেন, 'আসলে আমার প্রতিপক্ষ দলে একজন দক্ষ বা স্কিলড্ টেকনিকাল লোক ছিল, যে বোমাটাকে ডিফিউস করে দেয়।'

আমি হরেনবাবুকে প্রশ্ন করি, 'এসব পাঁচ হাজার বছর আগে ঘটেছিল?'

হরেনবাবু বলেন, 'অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। এসব আমার মনে থাকার কথাই নয়। কারণ, আমি স্মৃতিহীন। আমার স্মৃতি মুছে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতির কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্চর্য খেলা, আমার একটু একটু স্মৃতি ফিরে এসেছে।'

'যেমন আমার মনে পড়ে গেছে একবার কুশী নগরে, এক অশীতিপর বৃদ্ধাকে আমি পলান্ন খাইয়েছিলাম। আর আমার জীবন এতটাই অভিশপ্ত যে, সে খাবার খেয়ে তার ফুড পয়জন হয়। তিনি মারা যান। পরে তিনি ইতিহাস হন। গৌতম বুদ্ধ।

'আমার মনে পড়ে গেছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অজেয় বাহিনীর আমি প্রথম সারির একজন সৈনিক ছিলাম। বাহিনী তো অজেয় অমর ছিল না। আমি অমর ছিলাম, তাই বাহিনীর নাম ছিল অজেয় অমর বাহিনী।

'আমিই সেই লোক যে হিরে খনির সবচেয়ে গভীর অবধি যেতে পারতাম। কেউ যেতে পারত না। আমার তো মৃত্যু নেই, তাই আমি যেতাম। আমি খনির গর্ভ থেকে কোহিনুর হিরে তুলে এনে দিয়েছিলাম। তখন তার ওজন ছিল বহু বহু রতি। এখনকার দিনে প্রায় আটশো ক্যারেট। পরে যখন ইংল্যান্ডে তা কেটেকুটে পাঠানো হয়, তা ছিল একশো পাঁচ ক্যারেট।

'আমি ফরাসি বিপ্লব দেখেছি, আমি রোমে গ্ল্যাডিয়েটর হয়ে লড়েছি,

আমি আমার পাশের মানুষদের বুড়ো হয়ে মরে যেতে দেখেছি, আমার সন্তানদের জীর্ণদীর্ণ হতে দেখেছি, ওদের চোখে আমার জীবনের প্রতি সন্দেহ দেখেছি, আমি পৃথিবী বদলাতে দেখেছি, সভ্যতার বদল দেখেছি, কিন্তু নিজে বদলাইনি।

'ভাবতে পারো, ঘটা, এর চেয়ে বড় অভিশাপ কিছু হতে পারে? যাকে ভালোবাসছ, তাকে একটু একটু করে মরতে দেখছ। যে তোমায় ভালোবাসত, সে তোমায় সন্দেহ করছে। কারণ তোমার মধ্যে মৃত্যুর কোনো লক্ষণ নেই বলে।

'পালানো ছাড়া আর কোনো পথ আছে আমার বলো? আমার ওপর ওই দুই এক্সপেরিমেন্ট করে আমায় রাস্তায় ধাক্কা মেরে ফেলে ওরা বলেছিল, যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের লাশের স্তূপের মধ্যে প্রেত হয়ে তুই ঘুরে বেড়াবি উদ্দেশ্যহীন ভাবে, লক্ষ্যহীন ভাবে। জীবনের আসল লক্ষ মৃত্যু,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোর মৃত্যু হবে না।'

আমি হরেনবাবুকে বললাম, 'কে বলেছিল একথা?' হরেনবাবু আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যে আমার শরীরে অপারেশন দুটো করেছিল, যে আমার বোমাটাকে ডিফিউজ করেছিল। সেই সঙ্গে আরও পাঁচ জন ছিল। কিন্তু, মূল লোকটা সেই বাসুদেব কৃষ্ণ যাদব।'

'এ কথাগুলো আমার কিন্তু আজও মনে নেই। আমি পরে এগুলো পড়েছি বইয়ে, বইতে লেখা ছিল ওরা আমার মাথার মণি বার করে নিয়েছিল। আর আমায় অমর হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিল।

'আসলে বইয়ে গোটা প্রক্রিয়াটার একটা ইংগিত দেয়া হয়েছিল। আসল বিষয়টা তোমায় বললাম।

'তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না তাই তো? এই দেখো? বলে হরেনবাবু মাথার মাঙ্কি ক্যাপটা থেকে কপালটা বার করেন। দেখলাম একটা দাগ।

উনি বললেন, 'এটা চুল দিয়ে ঢেকে রাখি। এটা সেই লেজার সার্জারির দাগ যে সার্জারি করে আমার সব স্মৃতি লোপাট করেছিল ওরা। সে স্মৃতি আবার একটু একটু করে ফিরে আসছে। প্রকৃতির আশ্চর্য খেলায় সব স্মৃতি যদি ফিরে আসে, ঘটা ভাবতে পারো, কত যন্ত্রণা, কত মৃত্যু।'

'ওহ্।' হরেনবাবু দু-হাতে মুখ ঢাকেন, এক সময় তিনি উঠে দাঁড়ান। মাথার টুপিটা খোলেন। দেখলাম, মাথায় কালো ঝাঁকড়া চুল। উনি সোজা দাঁড়ালেন। ঝুঁকে নয়। একটু পায়চারি করলেন দৃপ্ত পায়ে, পা টেনে টেনে মোটেই নয়।

আমি বললাম, 'কোন বই পড়ে আপনি জানলেন, এ ঘটনা সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে ঘটেছিল।'

উনি আমার দিকে পিঠ রেখে বললেন, 'মহাভারত'। তারপর বললেন, 'আসি, তোমার সঙ্গে আমার আর কোনোদিনই দেখা হবে না।' তোমার বংশধরদের সঙ্গে হয়তো হতে পারে।

আমি বললাম, 'কোথায় যাবেন হরেনদা?' উনি বললেন, 'আজ থেকে দেড়শো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছর আগে সীমান্ত পার হওয়াটা সমস্যার ছিল না। কিন্তু আজ...দেখি হয়তো কাঁটাতার টপকাতে হবে। ওই দেখো আমার টেন আসছে।' আমি বললাম, 'কিন্তু, ওই টেনটা তো এখানে দাঁড়াবে না!'

হরেনবাবু একটু হাসলেন, 'শুধু তো হাতলটা হাতে পাওয়া। আমার তো মৃত্যু নেই।'

তারপর হুড়মুড় করে টেনটা প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে চলে গেল। আমি দেখলাম হরেনবাবু আমার পাশে নেই, তাকিয়ে দেখলাম, দূরে হারিয়ে যাওয়া টেনটার একটা গেটের হাতল ধরে হরেনবাবু দাঁড়িয়ে। হাওয়ায় ওনার কালো চুল উড়ছে।

এই বলে ঘটাদা চুপ করলেন।

রাজা বলল, 'বেশ! এ তো বিরিঞ্চিবাবারও বাবা। মহাভারত, কৃষ্ণ। যত সব ভাট্। তুমি পারো ঘটাদা।'

ঘটাদা বললেন, 'বাইবেলে জেনেসিস্-এ কেন্ বলে একটি চরিত্রের কথা বলা হয়েছে। যে হরেনবাবুর মতো মৃত্যুহীন অভিশপ্ত। সেটা তো বিশ্বাস করেছিস?'

'ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া বাঁদর, হরেনবাবুকে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে? কারণ সে ভারতীয় বংশদ্ভূত বলে, বাইবেল তো লেখা হয়েছে দু-হাজার বছর আগে—আর হরেনবাবু তো সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগের।

'কে বলতে পারে হরেনবাবুই বাইবেল জনিত কেন্ নয়? বা গ্রিক মাইথলজির টিথোনাস্? বা ইজিপশিয়ান মাইথলজির ওসাইরিস? এরা সবাই শাপিত। এরা মহাভারতের সময়ের অনেক পরের মানুষ। হরেনবাবুই সবচেয়ে প্রাচীন। ভেবে দেখ, হয়ত এরা সবাই আসলে হরেনবাবু। এক-একটা সভ্যতায় এক-একটা নামে চিহ্নিত হয়েছেন।

'তোদের দেশীয় কিছু বোঝাতে গেলে এত বিদেশি রেফারেন্স দিতে হয় কেন? রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে নোবেল না পেলে তাঁকে দিয়ে তো সিরিয়াল লেখাতি।

'নাহ্। বাড়ি যাই। কাল মেয়েটার আবার পরীক্ষা—' ঘটাদা উঠে দাঁড়ান। আমরা হইহই করে উঠলাম, 'কিন্তু হরেনবাবু মহাভারতের কোন চরিত্র?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটাদা অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে যেতে বলেন, 'হরেনবাবু আমায় বলেননি। মহাভারত পড়ে বুঝেছি।'

আমরা সমস্বরে বলে উঠি, 'কী বুঝেছ? কে?'

অন্ধকারে শুধু ঘটাদার গলা শোনা গেল, 'অশ্বত্থামা'।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

ম্যাজিশিয়ান

আজ রোববার। বীরেশের কেন জানি না মনে হয়েই চলেছে, আজ ও আসতে পারে। তার মানে প্রতি রোববারই যে ও আসে, তা কিন্তু নয়। ওর আসা এবং যাওয়া কোনওটাই আগে থেকে প্রেডিক্ট করা যায় না। কিন্তু আজ বীরেশ সকালের আকাশে একটা মাখন-মাখন গন্ধ পাচ্ছে। সে গন্ধটা কেমন চেনা মনে হচ্ছে। সুন্দর অতীত থেকে অনেক ছবি বয়ে নিয়ে আসছে গন্ধটা। সেইজন্যই রাতভোর কেন জানি না মনে হচ্ছে যে, আজকের দিনটা ভেরি স্পেশাল।

সুতরাং, আজকে ওর আসার চান্স আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীরেশ একটা বিশাল কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। সুখী সংসার। এক মেয়ে, বউ। একটা অ্যালসেশিয়ান। মেয়ে বারো ক্লাসে পড়ে। বিশাল ফ্ল্যাট, বিশাল মাইনে।

ছোটবেলা থেকে বীরেশ ভালো ছাত্র। ভালো সুকল, ভালো কলেজ, ভালো-ভালো মেধাবী বন্ধু। তারপর এক সময় ভালো চাকরি। তার পর উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে আজ এখানে। অফিসে সবাই 'স্যার' বলে ডাকে। ও সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে উঠে দাঁড়ায়।

বীরেশ যে-কোনও পা.তে গেলে সবাই সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলে। দু-চারজন মন্ত্রীর সঙ্গেও ওর ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। সরকারি মহলেও ওর অবাধ যাতায়াত।

সেই বীরেশ রায়—আজ রবিবার কার জন্য অপেক্ষা করছে মনে মনে? সে কোন কেউকেটা? রাজনৈতিক নেতা? কোনও বড় ফিল্ম স্টার? নাকি কোনও সুন্দরী মহিলা?

না, পাঠকেরা হতাশ হবেন। বীরেশ মনে-মনে যার জন্য অপেক্ষা করছে সে একজন ভবঘুরে বাউন্ডুলে। যে কোনও একসময় ওর সঙ্গে ইউনিভারসিটিতে পড়ত। তার পর হারিয়ে যায়, এবং হঠাৎই উদয় হয় বছর পাঁচেক আগে। তারপর থেকে বীরেশের সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ তৈরি হয়। কিন্তু সেটাও একতরফা। কারণ, বীরেশ তার ঠিকানা জানে না, তার টেলিফোন নম্বর জানে না। কারণ, সে টেলিফোন বা সেলফোন রাখে না। তার বেপরোয়া ভাব এবং এলোমেলো জীবনের জন্য বীরেশ একটু বিরক্তও বোধ করে। কিন্তু ওর প্রতি তীব্র আকর্ষণটাও বীরেশ কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না।

মাখনের গন্ধটা বেড়েই চলেছে আকাশে। নাহ্! আজ নির্ঘাত ব্যাটা আসবে।

বাড়ি ফিরে বীরেশ টাই খুলছে। স্ত্রী হেনা কোটটা খুলতে সাহায্য করছে। বীরেশ বলে, 'আজ কিছু খাব না। শুধু স্যুপ।'

হেনা প্রশ্ন করে, 'কেন? কী খেয়েছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীরেশ বলে, 'উঃ! আজ এত চাপ ছিল অফিসে। লাঞ্চ করতে-করতেই পাঁচটা বেজে গেল। বনি কোথায়?'

হেনা বলে, 'যা ববাবা! ভুলে গেলে? আজ সোমবার। বনি পড়তে গেছে।'

ওহ্! বীরেশের মনে পড়ে গেল, সোম আর বুধবার বনি, মানে তার মেয়ে, গড়িয়াহাটে একজন টিচারের কাছে পড়তে যায়।

হেনা বলে, 'তুমি ফ্রেশ হও। আমি সিরিয়ালটা দেখে নিই।'

বীরেশ বিরক্ত হয়ে নিজের ঘরে ঢুকে যায়। মনে-মনে বলে, 'সিরিয়াল না! সবক'টা সিরিয়াল কিলার। ঘরে-ঘরে এর প্রবেশ অবাধ। রান্নার মাসিও বলে, আটটার মধ্যে ছেড়ে দেবেন। অমুক সিরিয়ালটা দেখতে হবে। কী যে হচ্ছে সব।'

বীরেশ বিরক্ত অনেক কারণে। তার মধ্যে একটা হল, আগের রবিবারটা নিষ্ফল গেল শুধু প্রতীক্ষায়। যাকে সে আশা করেছিল, সে ব্যাটা আসেনি।

রাত তখন প্রায় এগারোটা। স্যুপ খেয়ে বীরেশ শুতে যাচ্ছে, এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠল।

হেনা, বনি দুজনেই খাবার টেবিলে। সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, এত রাতে আবার কে?

বীরেশের নাকে হঠাৎই সেই চেনা মাখনের গন্ধটা ভেসে এল। নিশ্চয়ই ওই ব্যাটা।

দরজা খোলা হল। ঠিক তাই। আকর্ণবিস্তৃত হাসি নিয়ে দুয়ারে দাঁড়িয়ে সূর্যচ্ছটা। বন্ধুরা যাকে ছটা বলেই ডাকে। গায়ে আন্ময়লা একটা কালো পাঞ্জাবি, একটা রংচটা জিন্স। কাঁধে একটা ব্যাগ। ওই ব্যাগের মধ্যে যে কী-কী পাওয়া যাবে, তার ধারণা ভগবানেরও নেই। অনেকদিন আগে একজন বলেছিল, 'ছটার ব্যাগে ডাইনোসরের ডিমও পাওয়া যেতে পারে।'

দরজায় দাঁড়িয়ে হেনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইয়র হাইনেস—ভেতরে আসতে দেবেন?'

বীরেশ ভাবে, এই শুরু হল ব্যাটার নাটক! মানুষকে পটাতে ব্যাটার জুড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেলা ভার।

সত্যিই তাই হল। হেনা গলে জল, 'এসো, এসো! রাতে কী খাবে?'

ছটা ঘরে ঢুকে পড়ে। হেনার দিকে তাকিয়ে বলে, 'চুলের স্টাইল চেঞ্জ করেছ তাই না?'

হেনা লজ্জিতভাবে হাসে।

ছটা দ্রুত বলে, 'না, না। দারুণ লাগছে। তোমার পার্সোনালিটিটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে।'

হেনা বলে, 'তুমি যে কী! এমনভাবে হুট করে আসো না—এখন যে কী খাওয়াই।'

ছটা বলে, 'তুমি তো অন্নপূর্ণা! যা খাওয়াবে তাই অমৃত। তবে যাই বানাও, নিরামিষ বানাও। আমার সঙ্গে আর একজন আছে। আজ রাতটা থাকব। কাল ভোরবেলা চলে যাব।'

বীরেশ কিছু বোঝার আগেই ছটা বাইরে বেরিয়ে যায়। এক থুরথুরে বুড়িকে সঙ্গে নিয়ে ঢোকে। আধ ময়লা একটা সাদা শাড়ি। শণের নুড়ির মতো চুল। বয়েসের ভারে বেঁকে গেছে।

ছটা বলে, 'চোখে ভালো দেখতে পায় না। আমি তোর গেস্ট রুমটায় ওনাকে নিয়ে যাচ্ছি। আমি এই সোফাটাতেই শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেব।' বলেই বুড়িকে নিয়ে গেস্টরুমের দিকে এগিয়ে গেল।

বীরেশ হতবাক। এ ব্যাটা এমন বিহেভ করে, মনে হয় এ বাড়িটা ওরই। এমনভাবে কথা বলে যেন অনুমতি নিচ্ছে না, মতামত জানাচ্ছে।

বউ বাচ্চার সামনে অপ্রস্তুত হওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যে বীরেশ একটা সিগারেট ধরায়।

হেনা রান্নাঘরে চলে যায় নিরামিষ খাবার বানানোর জন্য। বনি তখনও খাচ্ছে।

একটু পরেই ছটা বেরিয়ে আসে। বনিকে বলে, 'প্রিন্সেস, হানি সিং-এর গান কেমন লাগছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনি বলে 'দারুণ! কী এক্সাইটিং, তাই না?'

ছটা বীরেশকে বলে, 'কী রে, তোর কেমন লাগে? শুনেছিস লুঙ্গিডান্স?'

বীরেশ বিরক্ত হয়ে বলে, 'জঘন্য!'

ছটা বলে, 'জঘন্য কেন? আমার তো বেশ ভালোই লাগল। বেশ ঋকবেদের মতো মনোটনাস—আবার মডার্নও। তোরা মডার্নইজমটা বুঝিস না—।'

বনি হেসে বলে, 'ঠিক বলেছ কাকু। এরই নাম জেনারেশন গ্যাপ।'

বীরেশ দেখে ছটা বনিটাকেও হাত করে ফেলল।

ছটা বীরেশের থেকে একটা সিগারেট নিয়ে হেনার উদ্দেশে বলে, 'হাইনেস, একটু চা কি পাওয়া যাবে?'

রান্নাঘর থেকে জবাব এল, 'যাবে।'

ছটা বীরেশকে বলে, 'চল। বারান্দায় যাই।'

বীরেশের ভেতরে বহু প্রশ্ন বিদ্রোহ করছে। কিন্তু শান্তভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা ছটাকে দেখে সে কিছুতেই প্রশ্নগুলোকে বার করে উঠতে পারছে না।

এক সময় ছটা বলে ওঠে, 'ওনার ছেলেই ওনাকে কালীঘাট দেখানোর নাম করে কলকাতায় নিয়ে আসে। তারপর ভিড়ের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।'

বীরেশ প্রশ্ন করে, 'তোর চেনা?'

ছটা মাথা নাড়ে, 'না, না। আজকেই চিনলাম। রাসবিহারীতে ফুটপাথে বসে ছিলেন। চোখে ভালো দেখেন না। আলিপুরদুয়ারের কোন নোয়াগ্রাম নামে কোথাও থাকেন। আর তো কিছুই বলতে পারছেন না। জীবনে প্রথম গ্রামের বাইরে বেরিয়েছেন—।'

বীরেশ বলে, 'তুই নিজেই চিনিস না, আমার বাড়িতে নিয়ে এলি? এখন যদি ওর ছেলে পুলিশে ডায়েরি করে?'

'আমি এতক্ষণ থানার ওসির সঙ্গেই ছিলাম। সকাল থেকে কোনও ডায়েরি লেখা হয়নি। কেউ কোনও কমপ্লেনও করেনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীরেশ বলে, 'এবার কী করবি?'

ছটা সিগারেটে টান দিয়ে বলে, 'কাল সকালে টেনে আলিপুরদুয়ার যাব। তারপর ওনার গ্রাম খুঁজে বার করব। তারপর ওনাকে ছেলের কাছে ফেরত দিয়ে আসব। আর হ্যাঁ, পাঁচ-ছ'শো টাকা দে। যাওয়ার জন্যে তো খরচা আছে।' বলেই রান্না ঘরের দিকে এগিয়ে গেল, 'কী গো হাইনেস, চা কতদূর?'

বীরেশের রাগে গা-হাত-পা চিড়বিড় করছিল। সে কিনা একটা কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেকটার, আর তারই বাড়িতে তার অনুমতি ছাড়াই রাস্তা থেকে একটা বুড়িকে তুলে নিয়ে এল! এসে এমন একটা ভাব করছে, যেন কিছুই হয়নি!

বীরেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হনহন করে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায়। যা হওয়ার হবে। এসপার কি ওসপার! তার বাড়িতে এসব চলবে না।

রান্নাঘরে গিয়ে দেখে, একটা নীচু টুলে ছটা বসে। বনি আর হেনা হাপুস নয়নে কাঁদছে।

বীরেশ বুঝতে পারে, ছটা এতক্ষণ ওদের বুড়ির দুখভরি কাহানি শুনিয়ে ইমোশনাল করে দিয়েছে।

বীরেশ বলার কিছুই খুঁজে পেল না। হেনা ভাতের হাঁড়ি নামাতে-নামাতে বলে, 'ঠাকুরপো! তুমি এই বুড়ি মানুষটাকে নিয়ে কাল আলিপুরদুয়ারে গিয়ে কোথায় খুঁজবে? আমি বলি কী, তুমি কাল একাই যাও। আগে ওনার বাড়ি খুঁজে বার করো। তারপর ওনাকে নিয়ে যেও। এই বুড়ি মানুষকে নিয়ে কোথায় রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে? তুমি আগে ছেলেটাকে খুঁজে বের করো—ততদিন বরং উনি এখানেই থাকুন।'

বীরেশের রাগ এবার বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে। এরকমও হয়! ইমোশান মানুষকে এইভাবে গ্রাস করতে পারে? রাবণ যেভাবে বিভীষণের দিকে তাকিয়েছিল, হেনার দিকে সেইভাবে তাকিয়ে রইল। না, এ পদার্থ তো তার চেনা নয়! এই বদলটা এল কেমন করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার সে তাকাল 'এ পদার্থকে' যে বদলাল সেই ক্যাটালিস্টের দিকে। সে তখন রান্নাঘরের নীচু টুলে বসে ধীরেসুস্থে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। ভাবটা আগের মতোই! যেন কিছুই হয়নি।

একসময় চায়ের কাপটা নামিয়ে বীরেশের উদ্দেশে বলে, 'বেশ। তাই হোক।' তবে তুই পাঁচশো না, তিনশো টাকা দে। ওতে আমার হয়ে যাবে।'

বলে চায়ের কাপটা রেখে দক্ষিণ বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। ওখানে বীরেশের কুকুর র্যাম্বো রয়েছে। এমনিতে কেউ এলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তোলে। কিন্তু ছটার সঙ্গে ওর খুব দোস্তি।

ছটা বলেছিল, 'এ দেশে থাকে, বিদেশি নাম কেন? ওর নামটা বদলে দে।'

তারপর থেকে ছটা র‍্যাম্বোর একটা দেশি নাম রেখেছে। হরনাথ। ওই নামেই ছটা ওকে ডাকে। এবং পাজিটা সাড়াও দেয়।

বীরেশ দেখে, ছটা র‍্যাম্বোকে আদর করছে। আর র‍্যাম্বোও গদগদ হয়ে ওর হাত চাটছে।

বীরেশ বিরক্ত হয়ে শুতে বলে গেল।

AMARBOI.COM

সকালে ঘুম থেকে উঠে বীরেশ দেখে, ছটা হাওয়া। সে এখন আলিপুরদুয়ার অভিমুখে। রেখে গেছে রাস্তা থেকে তুলে আনা এক আশি বছরের বুড়িকে।

যন্ত্রণার একশেষ!

অফিসের কাজে দুদিন বীরেশকে ভুবনেশ্বর যেতে হয়েছিল। এয়ারপোর্টে নেমে দেখল, গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়ি এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

এখন বিকেল। বীরেশের এই সময়টায় ঘুম পায়। গাড়ির মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। একসময় গাড়ি গিয়ে দাঁড়ায় বাড়ির সামনে। বীরেশের ফ্ল্যাট দশ তলায়। লিফটে উঠে দরজায় পৌঁছে বেল বাজাল।

হেনা দরজা খোলে। দু-হাত ভরতি তেল। দু-চোখে প্রচুর উত্তেজনা।

বীরেশ জিগ্যেস করায় বলল, 'আচার বানানো শিখছি ঠাকুমার কাছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীরেশ নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে। জামা-কাপড় ছেড়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নেয়। এই সময়টা তার চা খাওয়ার সময়। হেনা কি ভুলে গেল? এরমধ্যেই বুড়িটার সঙ্গে হেবিব দোস্তি হয়ে গেছে!

একটু পরেই হেনা ঢোকে ঘরে। হাতে টে। চা এবং সঙ্গে মালপোয়া।

'ঠাকুমা বানিয়েছে। খেয়ে দেখো।'

বীরেশ গম্ভীর হয়ে ব্যাগ থেকে একটা ফাইল খুলে বসে।

হেনা ভ্রূক্ষেপ করল না। উত্তেজিত হয়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

বীরেশ একটু ইতস্তত করে একটা মালপোয়া মুখে দেয়। একটার পর আর-একটা...তারপর আর একটা...এভাবে সবক'টাই খেয়ে নিল। মনে মনে ভাবল, আরও ক'টা হলে ভালো হত। কিন্তু নিজের গাম্ভীর্যের বেড়াজাল ছিঁড়ে হেনার কাছে চাওয়াটা ঠিক হবে কিনা বুঝে উঠতে পারছে না।

ঘর থেকে বেরিয়ে সে বারান্দায় যায়। ইজিচেয়ারটাতে বসে। দেখে গেস্টরুমে মাটিতে পা ছড়িয়ে বনি বসে। বুড়িটা তার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। বুড়িটার মাথা এখনও দুলছে। হাওয়া দেওয়া বাঁশ পাতার মতো অবিরাম দোলে। বুড়িটা চুল আঁচড়ে দিতে দিতে বিড়বিড় করে কীসব বলছে, আর বনি খিলখিল করে হাসছে।

বীরেশ ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দেয়। আকাশে ঘরমুখো পাখিদের ভিড়। একটু পরেই অন্ধকার নামবে। তাই এই তাড়াহুড়ো। সব প্রাণীই ঘরে ফেরে, সবাই ঘর চায়। ঘর বড়ই প্রয়োজনীয় একটা কনসেপ্ট।

দশ তলার ওপর থেকে বীরেশ শহরটাকে দেখে। এত বড় একটা শহর। এত মানুষ, এত ঘর। কিন্তু সব ঘরই কি বসবাসযোগ্য হয়ে ওঠে?

ছটা অবশ্য বলে, 'বসবাসযোগ্যতা আসলে একটা দৃষ্টিকোণ। যেটা তোমার তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্কারকেও সৈনিকরা বাসযোগ্য মনে করে। কারণ ওই আশ্রয়টা তার প্রাণটাকে রক্ষা করছে। আবার পাঁচতারা কোনও হোটেলের কোনও সুইটে কোনও শিল্পপতি কমফর্টেবল ফিল করে। কারণ, সেখানে ওই আশ্রয়টা তার প্রাণ নয়, স্ট্যাটাসকে রক্ষা করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবটাই দৃষ্টিকোণ। বাজালে বাঁশি, ঘোরালে লাঠি।'

ছটা আরও বলে, 'আমি দুটোর মাঝামাঝি থাকি। যখন রোমে তখন রোমান। তোর বাড়িতে তোর মতো। আবার রিকশাওয়ালা ছেদিলালের ঝুপড়িতে তার মতো।'

বীরেশ বললে, 'তা হলে বলছিস তোর কোনও শেপ নেই! জলের মতো? শালা হিপোক্রিট!'

ছটা বলে, 'হিপোক্রিট সবাই। প্রত্যেকেই অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে পরিবেশের সঙ্গে অ্যাকাস্টম্ড হচ্ছে। নইলে সে সারভাইভ করবে না। আজ থেকে একশো বছর আগে বাতাসে যত কার্বন ছিল, আজ তার কুড়িগুণ হয়েছে। আমাদের ফুসফুস অ্যাকাস্টম্ড হয়েছে সেই কার্বনের সঙ্গে। তোর কথা অনুযায়ী, সে যদি রিজিড হত তা হলে আমরা কি বাঁচতাম? শোন, আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা প্রত্যঙ্গ হিপোক্রিট। পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে বদলে যায়, খাপ খাইয়ে নেয়। আর মানুষ তো এই প্রত্যঙ্গেরই ধারণ করা একটা স্ট্রাকচার। সে বদলালে দোষ কী?

বীরেশ ছটার কোনও কথাকেই খণ্ডন করতে পারে না। সেইজন্যই বোধহয় ছটার প্রতি ওর এত টান।

বারান্দায় বসে আকাশ দেখতে-দেখতে বীরেশের মনে হল, ছটা হয়তো এখন আলিপুরদুয়ারে। বুড়িটার বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

বীরেশ মনে-মনে ভাবে, অদ্ভুত! ও ব্যাটার কীসের দায়? যতসব উটকো কাজের কাজি!

বীরেশ আগেও দেখেছে, যত সব ছোটখাটো বিষয়কে ছটা এত বড় করে দেখে, যার কোনও মানেই হয় না। তোকে কে মুশকিল আসান হতে বলেছে? অঙ্ক নিয়ে মাস্টার্স করেছিস। কোথায় বিদেশে যাবি, বড় চাকরি করবি, তা না, পথে-পথে টো-টো কোম্পানি! একটা হাইলি এডুকেটেড ছেলের কি এই ফেট!

এ সব বললে ছটা বলে, 'শিক্ষাও এক ধরনের অস্ত্র। আমি মানুষকে ভালোবাসি। যুদ্ধ করতে চাই না। তাই অস্ত্র নিয়ে কী করব?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীরেশের মনে পড়ে গেল, একবার কলেজে একজন অধ্যাপক ক্লাসে অ্যাম্বিশান নিয়ে কথা বলতে-বলতে ছটাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'সূর্যচ্ছটা, তুমি কী হতে চাও?'

ছটা উঠে দাঁড়ায়, এদিক-ওদিক তাকায়। তারপর সিলিং-এর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে, যেন উত্তরটা সিলিং-এ লেখা আছে।

স্যার আবার প্রশ্ন করেন, 'বলো সূর্য, কী হতে চাও?'

ছটা এবার সিলিং থেকে চোখ নামায়। বলে, 'ইতিহাস।'

স্যারের মুখ রাগে লাল। ক্লাস ভরতি সবাই হাসতে শুরু করেছে। স্যার মুখ খোলেন। উনি রেগে গেলে সবাইকে 'আপনি' বলেন।

'শুনুন মিঃ সূর্যচ্ছটা, ইতিহাস বিষয়টা বড় ধূলিধূসর। আমার ক্লাসে ধূসর ইতিহাসের কোনও স্থান নেই। আপনি আসতে পারেন।'

ছটা নির্বিকারমুখে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল। ভাবটা এমনই, যেন কিছুই হয়নি।

পরের দিন বীরেশ একটু দেরি করেই বাড়ি ফিরল। অফিসে তার একটা অ্যান্টিলবি আছে, যারা তাকে খুব হেনস্থা করার চেষ্টা করছে। তাই খুব টেনশন।

বীরেশ জামা-কাপড় ছেড়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারটাতে এসে বসে। হেনা বনিকে নিয়ে একটা নেমন্তন্ন বাড়িতে গেছে, ফিরতে রাত হবে। বারান্দার উপরে একটা কাবার্ড আছে। একটু পরে বীরেশ সেখান থেকে একটা স্কচের বোতল নামায়। একটা গ্লাস আর জলের বোতল নিয়ে আসে রান্নাঘর থেকে।

রাত বাড়ে। অন্ধকার গাঢ় হয় বারান্দায়। মাথাটা কেমন হালকা লাগে বীরেশের। অন্ধকার আকাশটা কেমন নেমে আসছে। এসবই ওই বোতলের দ্রব্যগুণ, বোঝে বীরেশ। এও বোঝে যে, ঘুম আসবে না। টেনশন হলে এটা কম্পালসারি।

নেশাতুর চোখে অনেক নীচে পায়ে চলা পথটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ল্যাম্পপোস্টের আলো পথটাকে কেমন ভূতুড়ে করে রেখেছে। হঠাৎই বীরেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকে ওই পথটার মতো একা মনে হল। মনে হল, সে একটা অনির্দিষ্ট পথের মতো এগিয়ে চলেছে, সেখানে তার পাশে কেউ নেই।

সে জড়ানো বেসুরো গলায় গেয়ে ওঠে, 'একলা মানুষ মাল্গার্ভে, একলা মানুষ চিতায়।'

তার পরের কথাগুলো ভুলে যায়। মনে করার চেষ্টা করে। মনে পড়ে না।

কে যেন নীচু গলায় কী বলল। বীরেশ মাথা ঘোরায়। বারান্দার দরজায় গুটিসুটি মেরে কে যেন দাঁড়িয়ে—।

'কে?'

'বাবা। আমারে ডাকলা?'

বীরেশ এবার বোঝে, বুড়িটা তার গানকে ডাক ভেবেছে। বলে, 'না। তুমি যাও।'

বুড়ি নড়ে না, দাঁড়িয়েই থাকে।

বীরেশ জড়ানো গলায় আবার বলে, 'তুমি যাও। খেয়ে শুয়ে পড়ো।'

এবার অন্ধকারে বুড়ির গলা শোনা যায়, 'তুমি খাবা না?'

বীরেশ বলে, 'নাঃ! এই তো খাচ্ছি।'

একটু সময় নিয়ে বুড়ি বলে, 'কী খাও? হুইস্কি—?'

বুড়ি আবার শুধোয়, 'কেন খাও?'

বীরেশের মনে হল, সে কথা বলার একটা লোক খুঁজছিল। সে তার অফিসের পলিটিক্স...অ্যান্টিলবি...সবটা গুছিয়ে বলে যেতে লাগল। মাঝে-মাঝে যদিও মনে হচ্ছিল, বুড়ি কি কিছু বুঝছে?

কিন্তু বলার ইচ্ছে এখন তাকে পেয়ে বসেছে। সবটা শেষ না করে সে থামতে চাইছিল না। থামলও না। বলে যাচ্ছিল অনর্গল।

বুড়ি ঠায় দাঁড়িয়ে কাঁপতে-কাঁপতে শুনতে লাগল।

সবটা শেষ করে বীরেশ বলল, 'এইজন্যে খাই, বুঝেছ! টেনশন কমানোর জন্য। নইলে ঘুম আসে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার বুড়ির গলা ভেসে ওঠে, 'তুমি ঘুমাবা? আমি তোমারে ঘুম পাড়ায়ে দেব?'

বীরেশ অকস্মাৎ এ-কথার উত্তর দিতে পারে না।

দরজার অন্ধকার ঠেলে বুড়ি এগিয়ে আসে। বীরেশের মাথায় কাঁপা-কাঁপা হাতের স্পর্শ খেলে বেড়ায়, মানুষ্টা গুনগুন করে কী যেন গায়—।

বীরেশ পৌঁছে যায় তার শিল কুড়োনোর দিনে, লাটাই হাতে ঘুড়ির সঙ্গে মেঘের দেশে। সেখানে কোনও টেনশন নেই...কোনও অ্যান্টিলবি নেই...পলিটিক্স নেই।

ভোরবেলা বীরেশের ঘুম ভাঙে। সে কখন যেন বারান্দায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর হেনারা এসে তাকে তোলে। সে ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়েছে। তার আর কিছুই মনে পড়ে না।

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সে গেস্টরুমে উঁকি দেয়। দেখে, বুড়ি জপের মালা হাতে নিয়ে চোখ বুঁজে মন্ত্র আওড়াচ্ছে।

বীরেশ বাথরুমে ঢুকে পড়ে। একেবারে স্নান সেরে বেরোয়। কাল রাতে কিছু খাওয়া হয়নি—প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে।

হেনা আর বনি ঘুমোচ্ছে। ওদের উঠতে আরও একঘণ্টা। ততক্ষণ সে কী করবে, ভাবতে-ভাবতে ড্রইংরুমের দিকে গেল। দেখে, কাঁপতে-কাঁপতে বুড়ি এক কাপ চা আর প্লেটে দুটো মুড়ির মোয়া নিয়ে তার দিকে আসছে।

বীরেশ একটু লজ্জা পেয়ে বলে, 'এত সকালে...তুমি...আবার কেন...?'

বুড়ি কাঁপতে-কাঁপতে বলে, 'কাইল রাত থিকা কিছু খাও নাই। আমি তো ওইসব যন্ত্র চালাইতে পারি না...বউমা না ওঠা অবধি তুমি এই দিয়া চালাইয়া নাও।'

বীরেশ বোঝে, স্যান্ডউইচ মেকার, টোস্টার...এসব যন্ত্র ওনার পরিধির বাইরে। তাই সরল সমীকরণ, মুড়ির মোয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেতে-খেতে বীরেশের কেন জানে না, আবার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। ভুলেই গেল, গত পঁচিশ বছর সে মুড়িই খায়নি। আজ মনে হচ্ছে, সে যেন রোজই মুড়ির মোয়া খায়।

দিন চারেক কেটে গেছে। বাড়িতে রোজই কোনও না কোনও উৎসব। কোনওদিন পিঠে পুলি। কোনওদিন গুড়ের পায়েস। শেষমেশ একদিন সত্যনারায়ণ পুজো।

ফ্ল্যাটের কয়েকজন নিজেরাই যেচে পুজোয় অংশগ্রহণ করতে এল।

হেনার উৎসাহে কোনও ভাটা নেই। বনিরও তাই। সামনের ফ্ল্যাটের মিঃ সুব্রমনিয়ম, যাদের বীরেশের খুব একটা পছন্দ ছিল না, তারাও পুজোয় এল। হেনা সবাইকে কন্টেনারে করে পায়েস দিল।

সুব্রমনিয়ামও পরের দিন কন্টেনারে করে পোঙ্গল দিয়ে গেল। হইচই কাণ্ড, যেন কলেজের রিইউনিয়ন। এসব কাণ্ডের পেছনে যে আসল মানুষটা কে, তা বুঝতে বীরেশের অসুবিধে হয় না। ঝাপসা চোখ আর কাঁপা-কাঁপা শরীরে সে সমস্ত কর্মকাণ্ডগুলোর তদারকি করে চলেছে, নিঃশব্দে।

একদিন বীরেশ অফিস থেকে ফিরে দেখে বাড়ি থমথমে। হেনার দু-চোখ ফুলেছে। মনে হয় প্রচুর কেঁদেছে। বনির অবস্থাও তথৈবচ।

বীরেশ বুঝতে পারে কী হয়েছে।

'ছটা এসেছিল?'

হেনা ডুকরে কেঁদে ওঠে, 'নিয়ে চলে গেল।'

বীরেশ বনি আর হেনাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয়। বোঝায়, 'ওনাকে তো যেতে হত। ওনার তো ছেলে আছে। আমরা তো ওনার কেউ নই।'

বীরেশ বলে যাচ্ছে। কিন্তু বীরেশের মন অন্য কথা ভাবছে।...আর কেউ নিঃশব্দে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে না, ঘুম পাড়ানি গান শোনাবে না। সুক্তো রান্না করে খাওয়াবে না। যে-অনুভূতিগুলো, বহুদিন বন্দি থাকার পরে মুক্ত হয়েছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের আবার বন্দি করতে হবে।

বীরেশের কান্না পাচ্ছে। তাই সে জামা-কাপড় ছেড়ে বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে ট্যাপ খুলে দিল।

বীরেশ জানে, এবার ও নিজেই বুঝবে না ও কাঁদছে না স্নাত হচ্ছে। ও বোধহয় এটাই চাইছিল।

দিনটা রোববার। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বীরেশ একটা দিবানিদ্রার আয়োজন করছিল। হেনা বনিকে নিয়ে গেছে তার বোনের বাড়ি। তাদের বাড়িতে মন টিকছে না—বাড়িটা নাকি খা খা করছে।

ফোনটা বেজে উঠল। এসটিডি বুথের নাম্বার।

'হ্যালো—।'

ওপাশে ছটা।

'আরে, এ তো বিচ্ছিরি কাণ্ড এখানে—।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'বুড়িমা তো তার ছেলেকে পঞ্চায়েতের সামনে জুতো দিয়ে মেরে ত্যাজ্যপুত্র করল। পঞ্চায়েতের সবাই বলল, এবারের মতো ক্ষমা করে দাও। কিন্তু বুড়ির এক কথা। সে ছেলের সঙ্গে থাকবে না। দরকার হলে রাস্তায়-রাস্তায় ভিক্ষে করবে। কী করি বল তো? তোর কাছেই নিয়ে যাই, কী বল?'

বলেই ছটা তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় ফোনটা রেখে দিল।

অন্য সময় হলে বীরেশ প্রচণ্ড বিরক্ত হত, কিন্তু আজ দেখল সে মোটেই বিরক্ত হল না। তার ভুরু কুঁচকে উঠল না, চোয়াল শক্ত হল না। ছোটবেলায় প্রচণ্ড গরমে যখন হঠাৎ বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ হয়ে গেলেও একটা চাপা প্রশান্তি নেমে আসত, এখন সে তেমন বোধ করল। মনে হল, হেনাকে মোবাইলে ফোন করে খবরটা জানায়। কিন্তু কী ভেবে সেটা করল না। বেডরুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এবং ঘুমের মধ্যে স্বপ্নও দেখে ফেলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ বাড়িতে উৎসব লেগে গেছে। ফ্ল্যাটের বহু লোক এসে তাকে এবং হেনাকে অভিনন্দন জানিয়ে গেছে। পাশের ফ্ল্যাটের সুব্রমনিয়ম ধরা গলায় বীরেশের দু-হাত ধরে বলে গেছে, 'মি. রায়, ইউ আর গ্রেট।'

হেনার দু-চোখে বিশ্বজয় করার আনন্দ। বনি তো বুড়িমার আঁচল ছাড়ছে না। রান্নাঘরে নিরামিষ মাংস রাধা হচ্ছে। তার গন্ধে গোটা বাড়ি ভরে গেছে। আশপাশের ফ্ল্যাটের দু-চার জন মহিলা, সেই রেসিপি শেখা এবং টেস্ট করার জন্য যেচে আবেদন জানিয়ে গেছে।

বৃদ্ধা মানুষ্টা নিজে মাছ-মাংস খায় না। কিন্তু বীরেশ যেহেতু মাংস ভালোবাসে তাই নিজেই রান্না করছে। হেনাকে মুক্ত করে। হেনা মুক্ত পাখির মতো ফ্ল্যাট জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অপছন্দের হলেও বীরেশ আর ছটাকে আজ পান করতে অনুমতি দিয়েছে।

এই মুহূর্তে চাপ একটু কম। এখন রাত এগারোটা বেজে গেছে। লোকজনের ভিড় আর নেই। বনি আর হেনা খেয়ে নিয়েছে। ছটা আর বীরেশ জল পথে! আরও একজন না খেয়ে বসে আছে। হাজার বলাতেও সে ওদের দুজনের খাওয়া না হলে খাবে না বলেছে। কাঁপা-কাঁপা মাথা নিয়ে সে বারান্দার অন্ধকারে বসে আছে।

বীরেশ আজ অনর্গল কথা বলেছে। ছটা সামনে থাকলে সাধারণত অন্য কেউ মুখ খুলতে পারে না। কিন্তু আজ ছটা শ্রোতা। মুখে একটা অদ্ভুত হাসি।

বীরেশ আজ অনেক কিছু করেছে। বনির সঙ্গে গান গেয়েছে। হেনার সঙ্গে ঘর গুছিয়েছে। বৃদ্ধা মানুষ্টাকে জড়িয়ে ধরেছে এবং নিজেকে অবাক করে 'মা' বলেও ডেকে ফেলেছে।

এখন ওরা দুজন সিগারেট খাওয়ার জন্য বারান্দায় দাঁড়াল। বীরেশ ছটাকে বলে, 'কী রে! মাতাল হয়ে গেলাম নাকি?'

ছটা মাথা নাড়ে, 'না, মাতাল নয়। মানুষ।'

বীরেশ ছটার এইসব ফিলসফিক্যাল একস্প্লানেশনের অনেক উর্ধ্বে এখন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার গান গাইতে ইচ্ছে করছিল।

কিন্তু তখনই বনি চলে এল বারান্দায়। হাতে বীরেশের মোবাইল।

বীরেশ বিরক্ত হয়। বলে, 'কে?'

বনি বলে, 'তোমার বস্। খুব আরজেন্ট।'

বীরেশ সংবিৎ ফিরে পায়। ফোন কানে নিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে।

ফোনের ওপাশে পৃথিবীর প্রথম বিশজন ধনীদের একজন! হীরালাল আম্বানি।

'হ্যাঁ স্যার। কী হয়েছে?'

'সরি রয়, এই সময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে।'

'না স্যার, কী করতে হবে বলুন। আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইয়োর সারভিস।'

'না। বিষয়টা একটু পারসোনাল।...আচ্ছা, সূর্যচ্ছটা আপনার বন্ধু, তাই না?'

বীরেশের এবার নেশা কাটছে। হীরালাল আম্বানি, যাঁর কয়েক লক্ষ-কোটি টাকার সম্পত্তি, দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যে ব্রেকফাস্ট খায়, সে কিনা একটা হাড়হাভাতে বাউন্ডুলের খোঁজ করছে!

বীরেশ এবার আমতা-আমতা করে, 'হ্যাঁ, স্যার। আমার বন্ধু। কেন, ও আবার কী ঝামেলা পাকিয়েছে?'

ওপাশ থেকে হতাশ গলা ভেসে আসে, 'না—না, কিছুই পাকায়নি। আমি আসলে ওকে পাগলের মতো খুঁজছি। ওর তো কোনও অ্যাড্রেস নেই, কোনও ফোন নাম্বারও নেই। তাই ভাবলাম, আপনাকে ফোন করে দেখি। কোনও সন্ধান দিতে পারেন কিনা। শুনেছিলাম আপনি নাকি ওর বন্ধু।'

বীরেশ বলে, 'হোয়াট আ কোয়েনসিডেন্স স্যার! ও আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।'

ওপাশ থেকে উত্তেজিত গলা, 'তাই? দিন, দিন। ফোনটা দিন ওকে।'

বীরেশ যন্ত্রের মতো ফোনটা বাড়িয়ে দিল ছটার দিকে।

ছটা এতক্ষণ সব শুনছিল। তাই কোনও প্রশ্ন না করে নির্বিকারভাবে ফোনটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে বলে, 'বলুন।'

তারপর মিনিট পাঁচেক ধরে কী কথা হল...। ছটা শুধু হুঁ-হাঁ করে গেল।

তারপর বলল, 'ঠিক আছে। আসছি।'

বলে ফোনটা কেটে দিল।

তারপর রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে হেনাকে বলল, 'আমাকে একটা কৌটোয় দুটো রুটি আর কী আছে প্যাক করে দাও। এখুনি বেরোতে হবে।'

হেনা বলে, 'খাবে না?'

'রাস্তায় যেতে-যেতে খেয়ে নেব।'

বীরেশ এগিয়ে আসে। তার ধন্ধ কাটছে না। বলে, 'তুই আমার বসকে চিনলি কী করে?'

ছটা তার বিখ্যাত ব্যাগটা তুলতে-তুলতে বলে, 'কে? হীরুদা? অনেকদিন চিনি। গুজরাটে একবার ওর একটা মুশকিল সামলে দিয়েছিলাম। সেই থেকে পারিবারিক সম্পর্ক।'

বীরেশ কথা খুঁজে পায় না। ছটাটা আসলে কে? একটা ভবঘুরে! রিকশাওয়ালার সঙ্গে ঝুপড়ি শেয়ার করে, আবার হীরালাল আম্বানিকে 'হীরুদা' বলে ডাকে! সেই হীরুদাও তাকে পাগলের মতো খুঁজে বেড়ায়!

ছটা খাবারের প্যাকেটটা ব্যাগে ঢোকাতে-ঢোকাতে বলে, 'তোকে বলেই বলছি, হীরুদার একমাত্র ছেলে সানি, বেচারা ড্রাগ অ্যাডিকটেড হয়ে পড়েছে। এত ভায়োলেন্ট হয়ে গেছে যে, তাকে কোনও রিহ্যাবে নিয়েই যাওয়া যাচ্ছে না। হীরুদা আর মীরাদি খুবই আপসেট। এটা প্রেস হয়ে গেলে শেয়ার বাজারে একটা বড় ধস নামবে! তাই দেখি, কী করা যায়।'

বীরেশ বলে, 'তুই কী করবি?'

ছটা হাসে, 'হীরুদার ধারণা, আমি সানিকে কাউনসেলিং করলে ও ভালো হয়ে যাবে, সানিটা আবার আমার খুব ন্যাওটা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীরেশ হতভম্ব। বলে, 'তুই—তুই কাউনসেলিং করবি?'

ছটা অস্পষ্ট একটা হাসি হেসে বলে, 'ওই একটা কাজই তো পারি করতে। যেমন তোকে করলাম—।'

বীরেশের সব নেশা চটকে গেছে, 'ম্-মানে?'

ছটা উত্তর দেয় না। রান্নাঘরের কোণে দেওয়াল ধরে দাঁড়ানো বৃদ্ধার দিকে এগিয়ে যায়। তাকে জড়িয়ে ধরে। বুড়ির দু-চোখ ঝাপসা।

ছটা বলে, 'আসি গো, বুড়ি মা! আবার কবে দেখা হবে জানি না। মাংসটা কেমন হয়েছে, পরে ফোন করে বলে দেব।'

বৃদ্ধা ছটার পাঞ্জাবিটা খামচে ধরে।

ছটা খুব যত্নে বৃদ্ধার হাত ছাড়ায়। তারপর দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

হেনা বলে, 'এত রাতে যাবে কী করে? ড্রাইভারকেও তো ছেড়ে দিয়েছি—।'

ছটা তার ভুবনভোলানি বিখ্যাত হাসি হাসে, 'হেঁটে-হেঁটে চলে যাব। টালিগঞ্জ থেকে সল্টলেক আর কতটুকু! ভোরবেলায় পৌঁছে যাব।'

ছটা লিফটের সামনে এসে দাঁড়ায়। বীরেশ পিছনে।

ছটা ঘোরে, বীরেশের কাঁধে হাত রাখে। বলে, 'তুই একদিন প্রশ্ন করেছিলি, সব ঘরই কি বাসযোগ্য হয়ে ওঠে? আমি সেদিন সারকাস্টিক্যালি উত্তর দিয়েছিলাম। আজ বলছি, এবার তোর ঘরটা বাসযোগ্য হয়ে উঠল। আমাদের ইউনিভার্সিটির সিনিয়ার আশিসদার সেই কবিতাটা মনে আছে?'

বীরেশের সব জট কেটে গেল। সে শান্তগলায় বলে, 'তুই বল।'

ছটা বলে ওঠে,

'একটু সময় পেলে
নষ্ট করো না একা বসে,
একটি বন্ধু পেলে হারিও না
আপন দোষে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু লোভের বশে—

একলা-একলা বাঁচা

সে জীবন বাঁচাবার আসলে

সকলের বাঁচাকেই

সত্যিকারের বাঁচা বলে।'

ছটা লিফটে করে নেমে যায়।

বীরেশ এসে বারান্দায় দাঁড়ায়। একটা সিগারেট ধরায়। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় নীচের পায়ে চলা পথটা দেখা যাচ্ছে। এবার একটা শরীর সেই পথটার সঙ্গ নিল।

যে-পথটাকে এতদিন বীরেশের একলা, অনির্দিষ্ট মনে হত, কালো পাঞ্জাবি পরা, কাঁধে একটা ব্যাগ ঝোলানো শরীরটা সেই পথটার হাত ধরে তাকে নির্দিষ্ট করে দিল।

পথটা আর একলা থাকল না।

কালো পাঞ্জাবি পরা শরীরটা অন্ধকার চিরে এগিয়ে যাচ্ছে...দেখছে আকাশ...দেখছে বাতাস...দেখছে বীরেশ...শরীরটা এবার কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে।

এবার বোধহয় কুয়াশা মুছে যাবে। কারণ পথটা আর শরীরটার গন্তব্য তো ভোর অভিমুখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

আমরা পাথর বলছি

একটা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘর। দেওয়ালের চুনকাম উঠে এখানে-ওখানে প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের চেহারা নিয়েছে। ঘরের পাশ দিয়ে রেললাইন চলে গেছে। টেন গেলে ঘরটার বরফ-ঠান্ডা দেওয়াল থরথর করে কাঁপে—যেন বলতে চায়, 'আমি এখন শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে যেতে পারলেই বাঁচি।'

বাড়িটার মেয়াদও আর বেশিদিন নয়। এ-শহরের শ্যাওলা ধরা বাড়িগুলো গ্রাস করে নিচ্ছে ঝকঝকে ফ্ল্যাট বাড়ি। এ-বাড়িটার ভাগ্যেও তাই। সেই লেখা লিখে ফেলেছে এক প্রোমোটার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরটা একতলায়। আলো বাতাস ঢোকে না। ভাড়া চল্লিশ বছর ধরে বেড়ে-বেড়ে মাত্র একশো কুড়ি টাকা—তাও সাত মাস বাকি পড়ে আছে। বাড়িওয়ালা আর কিছু বলে না, কারণ, সে-ও জানে, আর ক'দিন!

সারা বাড়িটায় আর কোনও ঘর আস্ত নেই। নীচের এই ঘরটা ছাড়া। বাড়ির এই একটা ঘরেই লোক আছে। এ ছাড়া একঝাঁক ভূতুড়ে নৈঃশব্দ গোটা বাড়িটায় দাপাদাপি করে বেড়ায়—যেন ওরাও অস্থির-গৃহহীন হওয়ার ভয়ে।

বাড়িতে ইলেকটিসিটি নেই। তিন মাস হল কেটে দিয়েছে। এখন মোমবাতি ভরসা। লোকটা ঘরের এক কোণে শুয়ে আছে। নোংরা একটা তোশক, চাদরের বালাই নেই। একটা তেল চিটচিটে বালিশ। ওলটানো একটা কৌটোর ওপর মোমবাতিটা দাঁড়িয়ে জ্বলছে। লোকটা দেখছে—মোমবাতিটা গলে ছোট হচ্ছে। ডাক্তারের কথা অনুযায়ী আর দু-মাস।

একটা মশা লোকটার শরীর থেকে অনেকটা রক্ত খেয়ে ক্লান্ত হয়ে বিছানার একটা প্রান্তে বসে জিরোচ্ছে। লোকটা মশাটাকে বলে মনে-মনে, 'আমার রক্তে তোমার প্রাণ কি বাঁচবে বাপু?' এমনসময় ঘরের পাশ দিয়ে একটা ট্রেন যায়—ঘরের দেওয়ালগুলো বৃদ্ধা সধবা জেঠির মতো থরথর করে কাঁপতে থাকে কাঁপতে লোকটা শুয়ে-শুয়ে মনে-মনে বলে, 'আর ক'দিন!'

রাজেশ তেওয়ারি, বয়েস তিরিশ না ষাট বোঝা মুশকিল। কারণ তার আকৃতি। চর্বির প্রাবল্য তার সত্যিকার বয়েসকে একটা আলোছায়া বলয়ের মধ্যে ঘিরে রেখেছে। সাধু-অসাধু নানা ব্যবসার মালিক রাজেশ। তার এত টাকা, কেউই তার হিসেব জানে না—অবশ্যই সে নিজে ছাড়া। তেওয়ারি গত এক বছর ধরে একটি ছবি প্রোডিউস করার জন্য ডাইরেক্টর অরিন্দম রায়ের পিছনে ঘুরছে। কিন্তু লোকটা তেওয়ারিকে ল্যাজে খেলাচ্ছে, না সত্যি-সত্যি সময় নিচ্ছে তা বুঝে উঠতে পারছে না। আজ আবার অরিন্দমের সঙ্গে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। দেখা যাক, কী হয়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ধে সাতটা। অরিন্দম রায়ের ফ্ল্যাট। মুখোমুখি রাজেশ আর অরিন্দম। মাঝে একটা কাচের টেবিল—তার ওপরে পানীয়ের বোতল আর দুটো গ্লাস।

রাজেশ বলে, 'অরিন্দমবাবু, আপনি এত সময় নিচ্ছেন কেন? আমি তো টাকা রেডি রেখেছি। শুরু করুন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

অরিন্দম ঢুলুঢুলু চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বলে, 'আচ্ছা মিস্টার তেওয়ারি, এই ছবিটা করে আপনি কত টাকা প্রফিট আশা করছেন?'

তেওয়ারি একটু ইতস্তত করে বলে, 'দেখুন এটা আমার ফার্স্ট ফিল্ম—প্রোডাকশন কস্টটা উঠে গেলেই হবে। লাভ হলে ভালো।'

অরিন্দম অদ্ভুতভাবে হেসে বলে, 'প্রোডাকশন কস্টের চারগুণ টাকা যদি ঘরে আনতে পারেন?'

তেওয়ারি বিস্ফারিত চোখে বলে, 'আই বাপ! সে-ও কি সম্ভব?'

অরিন্দম বলে, 'সেজন্যেই তো বলছি—একটু ধৈর্য ধরুন। আমায় খুঁজতে দিন।'

তেওয়ারি ভুরু কুঁচ কে বলে, 'কী খুঁজবেন? ভালো গল্প?'

অরিন্দম অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নাড়ে—তারপর বলে, 'না, আসল নায়ক।'

তেওয়ারি বলে, 'নায়ক মানে হিরো? সে আপনি যাকে বলবেন তাকেই পাবেন। মানি ইজ নট এ ফ্যাক্টর। জিৎ আছে, প্রসেনজিৎ আছে, দেব আছে, রাহুল আছে...যদি বলেন বোম্বে থেকেও কাউকে আনতে পারি।'

অরিন্দম মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'আরে ধুর...এরা সব পরদার হিরো। এরা কেউ ছবি হিট হবে কি না আগে থেকে গ্যারান্টি দিতে পারে না। আমার চাই এমন কাউকে যে আমার ছবিকে হিট করাবে—এবং করাবেই!'

তেওয়ারি হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বলে, 'কাকে চাইছেন?'

অরিন্দম সোফার পিছনে মাথা এলিয়ে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, 'আমার চাই অপরাধ—মানে ক্রাইম।'

তেওয়ারি বড়-বড় চোখে তাকিয়ে বলে, 'ইউ মিন আন্ডারওয়ার্ল্ড? দেখুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরিন্দমবাবু, এসব আন্ডারওয়ার্ল্ড-এর লোকেরা ঢুকে পড়লে ছবিতে আমার কন্ট্রোল কি আর থাকবে?'

অরিন্দম বিরক্ত হয়ে গ্লাসটা তুলে নিয়ে একটা চুমুক দেয়। তারপর বলে, 'আপনি একটা গাধা। পড়াশোনা তো করেন না! বালজাকের নাম শুনেছেন?'

তেওয়ারি মাথা নাড়ে, বলে, 'বাল থ্যাকারের নামে শুনেছি।'

অরিন্দম হতাশ হয়ে আবার শরীরটা এলিয়ে দেয় সোফায়। তারপর বলে, 'বালজাক একজন মহান লেখক ছিলেন। উনি বলেছিলেন, "দেয়ার মাস্ট বি আ ক্রাইম বিহাইন্ড এভরি সাকসেস।" মানে, প্রত্যেক সফল কাজের পেছনেই একটি অপরাধের ভিত্তিপ্রস্তর থাকে। ভিত্তিপ্রস্তর মানে জানেন? ফাউন্ডেশান স্টোন।'

তেওয়ারি বিস্মিতভাবে বলে, 'অরিন্দমবাবু, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সবটাই মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। আমার ছবির সঙ্গে ফাউন্ডেশান স্টোন মানে, ভিত-পাথরের কী সম্পর্ক?'

অরিন্দম বলল, 'উঁহু...শুধু ভিত-পাথর নয়—ফাউন্ডেশান স্টোন অফ ক্রাইম—মানে অপরাধের ভিত-পাথরের দরকার।'

তেওয়ারি বলে, 'আপনি সেটাই খুঁজছেন?'

অরিন্দম বলে, 'না, খুঁজছি না—খুঁজে পেয়ে গেছি। এবার তাকে রাজি করানোর পালা।'

তেওয়ারি বলে, 'ব্যস, এটুকুই? কত টাকা লাগবে বলুন?'

অরিন্দম মাথা নেড়ে বলে, 'না, টাকা দিয়ে হবে না। টাকা পেলে ও আমাদের জন্যে এই ক্রাইমটা করবে না। ওকে রাজি করাতে হবে অন্য কিছু দিয়ে। ওরই অসম্ভব কোনও অধরা স্বপ্নকে দিয়ে।'

তেওয়ারি হতভম্ব হয়ে বলে, 'অরিন্দমবাবু, কিছুই বুঝছি না। কী বলতে চাইছেন? কী করতে চাইছেন?'

অরিন্দম এবার সোজা হয়ে বসে, তারপর পরিষ্কার গলায় বলে, 'ওটা আমার হাতেই ছেড়ে দিন। আপনি বরং সামনের সপ্তাহে আসুন। ঠিক এই সময়ে। এবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি আসতে পারেন।'

তেওয়ারি উঠে দাঁড়ায়—তারপর অনেক দ্বিধা ও সংশয় জড়ানো পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

স্যাঁতসেঁতে ঘরটার মধ্যে তেলচিটে বালিশ আর তোশকের ওপরে লোকটা কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল কে জানে—শুধু ঘুমিয়েই পড়েনি, ঘুমিয়ে স্বপ্নও দেখছিল। টেন যাওয়ার কাঁপুনিতে তার ঘুম ভেঙে গেল। ভেঙে গেল স্বপ্নটা। লোকটা বিরক্ত হল। কারণ, লোকটা তার সবচেয়ে প্রিয় স্বপ্নটাই দেখছিল। রোজই সে এ-স্বপ্নটাই দ্যাখে। এই একটাই স্বপ্ন তার কাছে একঘেয়ে হয়ে ওঠেনি।

ইদানীং এই স্বপ্নটা সে প্রায়ই দ্যাখে—কারণ এখন তার ঘুমোনো এবং জাগা ছাড়া সেরকম কোনও কাজ নেই। তাই দিনের মধ্যে তিন-চারবার ঘুম তাকে জাপটে ধরে। আর ঘুমের মধ্যে সেই স্বপ্নটা একবার না একবার আসেই। হতদরিদ্র গৃহস্থ বাড়িতে অতিথির মতো। তার মনে হয়—এই স্বপ্নটাতেই সে বাঁচে।

তার এই দীর্ঘ চল্লিশ বছরে, খয়াটে চাঁদের মতো জীবনে, প্রথম দশটা বছরই সে বেঁচেছিল। এ-স্বপ্ন সেই ফেলে আসা দশ বছরের স্মৃতির স্বপ্ন। মায়ের কোলে, উনুনের ধোঁয়ার গন্ধ—ঘরের মাটির দাওয়ায় তার এলোমেলো পায়চারির শব্দ—বৃষ্টি-রাতে মায়ের ঘুম্পাড়ানি গান। ব্যাঙের ডাক। টিনের ছাদে বৃষ্টির এলোপাতারি ঢিল—রাতবুড়োর লাটাইয়ে সুতো ছাড়ার শব্দ। এসব পাঁচমিশেলি শব্দ-গন্ধেরা তার সেই স্বপ্নে হানা দেয়। স্বপ্নের মধ্যে সে দ্যাখে ফ্রেমের মধ্যে রাখা একটা জীবন-ছবিকে। যে-ফ্রেমটাতে ঘুণ ধরে গেছে, কিন্তু ছবিটা বিবর্ণ হয়নি। ফ্রেমে রাখা সেই জীবন-ছবিটা তাকে ডাকে। ফ্রেমটার মধ্যে সে কত সাবলীল-নির্ভিক-শঙ্কাহীনভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এর নামই তো বাঁচা!

কিন্তু তারপর?

এ তো গেল তার দশ বছর অবধি জীবনস্মৃতির ফ্রেম। তার পর সে আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁচেনি। এই শহরটা একটা অজগরের মতো তাকে গিলে ফেলেছিল।

পেশার পর পেশা বদলেছে সে। কখনও আকাশকে কখনও ঘরের সিলিংকে ছাদ করে দিন গুজরান করেছে। এটাকে বাঁচা বলে না। দীর্ঘদিন প্র্যাকটিসে না থাকলে মানুষ যেমন গান গাইতে ভুলে যায়, ঠিক তেমনি দীর্ঘদিন না বাঁচলেও মানুষ ঠিকঠাক বাঁচতে ভুলে যায়। তার বাঁচতে ইচ্ছেও করে না। অর্থ খুঁজে পায় না জীবনের। জীবন তো পড়ে আছে সেই তিরিশ বছর আগে। তার গ্রামের মাটির বাড়ির দাওয়ায়। মায়ের ঘামে ভেজা আঁচলে। মাঠের ধুলোর গুঁড়ো-গুঁড়ো হাত-বুলুনিতে। আর সেটা তো ওয়ান ওয়ে টাফিক। সময়ের 'নো এন্ট্রি' বোর্ড লাগানো। না, আর ফেরা যাবে না।

লোকটা এবার চিত হয়ে শোয়। পেটের ভেতরে টিউমারটা দুলে ওঠে। ডাক্তার বলেছে আর বেশিদিন নয়। টিউমারটা এবার ফেটে যাবে। তার চল্লিশ বছরের ব্যর্থ জীবনটা মুখ ফেরাবে হয়তো অন্য এক জীবনের খোঁজে। লোকটা মনে-মনে ভাবে —সে-জীবনটা যদি তার ফ্রেমে রাখা জীবনের মতো হয়। তা হলে তো কথাই নেই! আর যদি না হয়, তা হলে সে কিছুই খুঁজবে না। আবার একটা ব্যর্থ জীবনের সূত্রপাত করতে সে নারাজ।

লোকটা এবার উঠে বসে। আজকাল তার খিদে খুব কম পায়। কিন্তু তেষ্টা পায় বেদম। লোকটা দুটো নোংরা প্লাস্টিকের খালি বোতল তুলে নেয়। তারপর ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ায়। দরজা খুলে বাইরে যায়। বড় রাস্তার সামনে টিউবওয়েল। কাল রাত থেকে পেটে একফোঁটা জল পড়েনি। লোকটা টিউবওয়েলটার দিকে এগিয়ে যায়। লোকটা জানতেও পারে না, রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়ির ভেতর থেকে একটা লোক টেলিস্কোপিক লেন্স লাগানো ক্যামেরায় ওর ছবি তুলে যাচ্ছে পরপর।

কথা অনুযায়ী রাজেশ তেওয়ারি পরের সপ্তাহে ডাইরেক্টর অরিন্দমের বাড়ির দরজার সামনে এসে হাজির। বেল বাজায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরিন্দম নিজেই দরজা খোলে। তার মুখ উত্তেজনায় চকচক করছে।

'আসুন, মিস্টার তেওয়ারি, বসুন।' তারপর টেবিলের ওপর থেকে একতাড়া ছবি তুলে তেওয়ারির হাতে দিয়ে বলল, 'নিন, মিস্টার তেওয়ারি, এই হল আমাদের ছবির আসল হিরো।'

তেওয়ারি ছবিগুলো দ্যাখে, হতভম্ব হয়ে অরিন্দমের দিকে তাকায়। বলে, 'আপনি কি আমার সঙ্গে জোক করছেন? এ তো একটা আন্মরা লোক।'

অরিন্দম চোখ কুঁচকে বলে, 'মিস্টার তেওয়ারি, এই আন্মরা লোকটাই আমাদের বাঁচাবে।'

তেওয়ারি প্রশ্ন করে, 'আপনার প্ল্যানটাই বা কী? আর লোকটাই বা কে?'

অরিন্দম বলে,'আপনাকে বালজাকের একটা কোটেশান শুনিয়েছিলাম, মনে আছে?..."দেয়ার মাস্ট বি আ ক্রাইম বিহাইন্ড এভরি সাকসেস।" '

তেওয়ারি বিরক্ত হয়ে বলে, 'আরে তার সঙ্গে এই লোকটার কী সম্পর্ক?'

অরিন্দম বলে, 'সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আমরাই গড়ে তুলব। এই লোকটা একজন ভাগ্যহীন—জীবনে কোনও কাজেই কোনওভাবে সফল হয়নি। তিরিশ বছর আগে বহিরাগত খেদাও আন্দোলনের শিকার হয়ে এদেশে পালিয়ে আসে। তারপর থেকে ব্যর্থতা আর ব্যর্থতা। দারিদ্র এবং একাকিত্ব গত তিরিশ বছর ধরে লোকটার ছায়াসঙ্গী। মাসখানেক হল লোকটার পেটে একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল। স্থানীয় একজন ডাক্তারের কাছে যায়। ডাক্তার বলে, তার পেটে একটা টিউমার হয়েছে। সে আর বেশিদিন বাঁচবে না।'

তেওয়ারি অধৈর্য হয়ে জিগ্যেস করে, 'কোনওভাবেই বাঁচবে না?'

অরিন্দম ভাবলেশহীনভাবে বলে, 'কেন বাঁচবে না? অপারেশান করলেই বেঁচে যাবে!

তেওয়ারি অস্ফুটভাবে বলে, 'কিন্তু ডাক্তার যে বলেছে...।'

অরিন্দম একটা সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বলে, 'ডাক্তারকে তো আমিই বলেছি ওই কথা বলতে। আর হ্যাঁ, মিস্টার তেওয়ারি, আপনাকে বিলটা পাঠিয়ে দেব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর জন্যে টাকা দিতে হয়েছে।'

তেওয়ারি বলে, 'অরিন্দমবাবু, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

অরিন্দম বলে, 'বুঝলেন না? আসলে লোকটা বাঁচতেই চায় না। আর আমি ডাক্তারকে দিয়ে ওর মৃত্যুটা শুধু কনফার্ম করে নিলাম। আর এটাই আমাদের একমাত্র ভরসা—বা আমাদের প্ল্যানের প্লাস পয়েন্ট যে, লোকটা তার মৃত্যুর খবর পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছে, সে আর কোনও সেকেন্ড ওপিনিয়ানে যাবে না। এখন মৃত্যুটা তার কাছে স্পিরিচুয়াল হ্যাঙওভারের মতো ঃ "মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান।" এতদিন সে বাঁচতে চাইত না। এখন সে মরতেও দ্বিধা বোধ করবে না।'

তেওয়ারি বলে, 'বুঝলাম, কিন্তু আপনার প্ল্যানটা কী?'

অরিন্দম তার সাত তলার ফ্ল্যাটের জানলার সামনে এসে দাঁড়ায়। জানলা দিয়ে নীচে তাকায়। নীচে কালো পাড়ের মতো রাস্তা। সেখানে থিকথিক করছে মানুষ, বিক্ষোভ, ব্যস্ততা ও দূষণ।

অরিন্দম তার প্ল্যান বলতে থাকে তেওয়ারিকে। নীচে কালো পাড়ের মতো রাস্তাটায় নিওন আলোর ছায়া পড়ে। বিক্ষোভ, দূষণ, ব্যস্ততায় ঘেরা মানুষগুলো সেই নীলাভ আলোয় স্নান করে।

শহরে রাত বাড়তে থাকে আয়ুর মতো।

সময়—তিনমাস পর। স্থান—অরিন্দমের ফ্ল্যাট। পাত্র বা পাত্রী—দুজন। তেওয়ারি এবং অরিন্দম। দুজনের হাতেই পানীয়ের গ্লাস। মুখোমুখি সোফায় বসে। দুজনের চোখেই উত্তেজনার ছাপ।

তেওয়ারি বলে, 'অরিন্দমবাবু, ছবি তো শেষ। কাল তো রিলিজ। বাকিটা আপনার প্ল্যান মতো হবে তো?'

অরিন্দম অন্যমনস্কভাবে বিড়বিড় করে, 'আলবাত হবে। হতেই হবে।'

তেওয়ারি গ্লাসে চুমুক দিতে-দিতে বলে, 'লোকটা আমাদের ডোবাবে না তো?'

অরিন্দম ভুরু কুঁচকে তেওয়ারির দিকে তাকায়। বলে, 'কোনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিন-ই নেই। ওর অন্য কোনও অপশনও নেই। আমার অবজারভেশন মিথ্যে হতে পারে না।'

তেওয়ারি বলে, 'আপনাকে কতবার বললাম লোকটাকে একটু চোখে-চোখে রাখি। কোনও ভালো জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে দিই—ভালো খাবারদাবার-মদ। মানে, একটু ফুরতি-টুরতির সুযোগ। তা আপনি কিছুতেই রাজি হলেন না।'

অরিন্দম বিরক্ত হয়ে তেওয়ারিকে বলে, 'আপনি কেন বুঝতে পারছেন না, মিস্টার তেওয়ারি, আমরা ওর বাঁচতে না চাওয়ার ইচ্ছেটাকেই ক্যাপিটাল করছি। ওকে ভালোভাবে রাখলে ওর বাঁচার ইচ্ছেটা ফিরে আসতে পারে। যেটা আমাদের পক্ষে খুব রিস্কি।' তারপর অন্যমনস্ক হয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বলে, 'আর তো তিনটে দিন! ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ, মিস্টার তেওয়ারি। বালজাকের থিয়োরি কখনও মিথ্যে হতে পারে না।'

স্যাঁতসেঁতে ঘরের মধ্যে লোকটা শুয়ে কড়িকাঠ গুনছিল। মোমবাতিটা গলতে-গলতে জ্বলছিল, না জ্বলতে-জ্বলতে গলছিল—কে জানে! কিন্তু ওটা ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত ছায়াময়তা তৈরি করছিল যা দেখে গা ছমছম করে।

লোকটা সবটাই দেখছিল। এক সময় মনে-মনে সে বলে, 'মরুক গে।' এই আলো, এই ছায়া—কোনওটাই তার কোনও কাজে লাগবে না। আর তো মাত্র একটা দিন—তার পরেই এক নতুন জীবনের অভিমুখে যাত্রা। ভগবানকে বলে, 'সেই জীবনটা যেন তার স্মৃতির ফ্রেমে রাখা জীবনটার মতোই হয়।'

লোক দুটো তাকে কথা দিয়েছে—বাড়িওয়ালার বাকি দশ মাসের ভাড়া বারোশো টাকা দিয়ে দেবে। আর তার এই ব্যর্থ জীবনের শেষ চিহ্ন, তার চিতাভস্ম বা ছাই—তার শৈশবের চারণভূমি বার্মার সেই গ্রামে, সেই মাঠে, সেই দাওয়ায়, সেই ঝোপে ছড়িয়ে দিয়ে আসবে। দুটো লোকের একটা লোক বেশ মোটা, আর-একটা লোক কেমন কবি-কবি দেখতে। এই কবি-কবি লোকটাই বড় ভালো কথা বলে। লোকটা বলছিল, 'তুমি ছড়িয়ে যাবে ছাই হয়ে তোমার শৈশবে। সেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার ক্ষয় নেই, লয় নেই, ভয় নেই। তুমি অখণ্ড—অমর হয়ে থাকবে।'

আরও কত কথা বলেছিল! সব কথার মানে বোঝেনি সে, কিন্তু শুনতে বড়ই ভালো লেগেছিল। কবি-কবি লোকটা তার হাত ধরে কথা বলেছিল। তাকে বন্ধু বলে সম্বোধন করেছিল। এই প্রথমবার তার নিজেকে একজন মানুষ বলে মনে হয়েছিল। কৃতজ্ঞতায় তার চোখে জল এসেছিল। কান্নায় গলা বুজে এসেছিল। তার মনে হয়েছিল যারা তাকে এত ভালোবাসা দিল, এত তত্ত্বকথা শোনাল, তাদের জন্য সে সবকিছু করতে পারে।

কড়িকাঠ দেখতে-দেখতে লোকটা ভাবে, কাল সে তাই করতে যাচ্ছে।

লোকটা পাশ ফিরে শোয়। ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দেয়।

অন্ধকার নেমে আসে, দেওয়াল থেকে উধাও হয়ে যায় আলো না ছায়া—কে জানে!

সারা শহরে চাঞ্চল্য। টিভি চ্যানেল এবং খবরের কাগজের হেডলাইন মানুষকে সম্মোহিত করে দিল। খবরে প্রকাশ—বিখ্যাত পরিচালক অরিন্দম রায়ের ছবি 'অন্তর্দহন' মুক্তি পাওয়ার তৃতীয় দিনে শহরের কোনও একটা প্রেক্ষাগৃহে, ছবিটির শেষ দৃশ্যে যখন নায়ক তার সারা গায়ে পেটোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে—প্রতিবাদ স্বরূপ, ঠিক তখনই প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে থাকা একজন অচেনা মানুষ মঞ্চে উঠে যায় এবং একটি বোতল থেকে পেটোল নিজের গায়ে ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যে লোকটির মৃত্যু হয়।

এটা কি ছবি দেখার আফটার-এফেক্ট? নাকি লোকটার মস্তিষ্ক বিকৃত ছিল?

এই নিয়ে সারা শহর তোলপাড়।

এরই মধ্যে সাতদিনের জন্য 'অন্তর্দহনের' সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে গেল। পরের সপ্তাহে মানবাধিকার কমিশন থেকে ছবিটার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করার আবেদন জানাল। ছবির বাজার তখন তুঙ্গে। চারগুণ দামে টিকিট ব্ল্যাক হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারা শহর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে হলগুলোতে। কী আছে এ-ছবিতে যা দেখে একজন মানুষ আত্মহত্যা করে ফেলে?

অরিন্দমের ফ্ল্যাটে একটা পা. চলছিল। একটু আগেই সেটা শেষ হয়েছে। অতিথিরা একে-একে বিদেয় হওয়ার পরে এখন মুখোমুখি তেওয়ারি এবং অরিন্দম। দুজনেরই একটু নেশা হয়েছে। দুজনের চোখেই জয়ের উচ্ছ্বাস।

অরিন্দম সোফায় হেলান দিয়ে তেওয়ারিকে বলল, 'কী, মিস্টার তেওয়ারি, এবার কি মনে হচ্ছে?'

তেওয়ারি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দু-হাত তুলে নমস্কার করে বলে, 'জয় বাবা বালজাক! আপনি ঠিকই বলেছিলেন। আট গুণ টাকা তুলে নিয়েছি। সবক'টা হল হাউসফুল যাচ্ছে। এটা টোয়েন্টি ফিফ্‌থ উইক। চলুন, নতুন ছবিতে হাত দিই।'

অরিন্দম সোফায় এলিয়ে বসে, তারপর বলে, 'দাঁড়ান, অনেক চাপ গেল। ক'টা দিন রেস্ট নিই।' তারপর একটু থেমে কৌতুকের সুরে বলল, 'বাই দ্য ওয়ে, মিস্টার তেওয়ারি, চিতাভস্ম বার্মায় পাঠানো হল কি?'

তেওয়ারি পেট চেপে হাসতে থাকে : 'চিতাভস্ম? বার্ম? হো-হো।'

ওরা দুজনেই হাসতে থাকে।

দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির কাঁটাগুলো নির্বিকারভাবে চলতে-চলতে ওদের দেখছিল।

ঘটনাটা ঘটল ঠিক পরের দিনই। সকালবেলা কলিংবেলের আওয়াজে অরিন্দমের ঘুম ভাঙল।

অরিন্দম একাই থাকে।

বিরক্ত হয়ে ও দরজা খোলে।

দরজার ওপারে কাগজের মতো সাদা মুখ নিয়ে তেওয়ারি। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক নিশ্বাসে অরিন্দমকে বলে, 'আপনি কি আরও কাউকে প্ল্যান্ট করেছিলেন?'

অরিন্দম তো অবাক!

'মানে?'

তেওয়ারি বলে, 'আপনি কি আরও কাউকে এরকম কাজে লাগিয়েছিলেন?'

অরিন্দম বলে, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

তেওয়ারি কাঁপা-কাঁপা হাতটা অরিন্দমের দিকে বাড়িয়ে দেয়। সে-হাতে সেই দিনেরই খবরের কাগজ।

হেডলাইনটা দেখেই অরিন্দমের চোখ স্থির হয়ে যায় ঃ

অরিন্দম রায়ের ছবি 'অন্তর্দহন' দেখে ঠিক একইভাবে হলের মধ্যে আর-একজনের আত্মহত্যা পঁচিশতম সপ্তাহে।

অরিন্দম মুখ তুলে তেওয়ারির দিকে তাকায়।

তেওয়ারি বলে, 'আমি ভাবলাম এ বোধহয় আপনারই লোক।'

অরিন্দম মাথা নাড়ে : 'আমি একে চিনি না। আমার লোক না।'

তেওয়ারি বলে, 'এ পুরো প্ল্যানটা আমি আর আপনি ছাড়া আর তো কেউ জানে না! একে তো আমি চিনি না। তাই ভাবলাম আপনি হয়তো চেনেন।'

অরিন্দম অধৈর্যভাবে বলে, 'বললাম তো, আমি একে চিনি না। প্রথম লোকটা আমাদের প্ল্যান্ট করা—এই দ্বিতীয় লোকটা কে?'

দুজনেই জড়বুদ্ধির মানুষের মতো এ-ওর দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

মানবাধিকার কমিশন, খবরের কাগজ—'অন্তর্দহন' ছবিটাকে টারগেট করে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একদল মানুষ বলছে, 'এ ছবি ইমিডিয়েট বন্ধ করে দেওয়া উচিত।'

আর একদল বলছে, 'শিল্পীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারুর নেই।' এসব ডামাডোলে 'অন্তর্দহন' ছবিটা তখন রকেটের গতি নিয়ে ফেলেছে।

এখন আর রাজ্য জুড়ে নয়—সারা দেশ জুড়ে ছবির প্রিন্টের চাহিদা বাড়তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরু করে দিল। আন্তর্জাতিক ফেস্টিভ্যালগুলো থেকে ছবিটাকে পাঠানোর অনুরোধ আসতে শুরু করে দিয়েছে। অরিন্দমের পিছনে প্রোডিউসারদের লাইন লেগে গেছে।

আর তেওয়ারি?

তার হাতে এখন যেন টাকা ছাপানোর যন্ত্র এসে পড়েছে।

প্রচুর অভিনন্দন সাধুবাদ, পুরস্কার—সবকিছুর প্রাপ্তি ঘটলেও শান্তি পাচ্ছে না দুজন মানুষ—অরিন্দম আর তেওয়ারি।

একটাই প্রশ্ন ওদের কুরে খাচ্ছে।

দ্বিতীয় মানুষটা কে?

আবার একই ঘটনা ঘটল চল্লিশতম সপ্তাহে। এবারেও জানা গেল না স্তীয় ব্যক্তিটি কে।

মানবাধিকার কমিশনের লোকেরা রাস্তায় নেমে পড়ল। হল ভাঙচুর হল। রাস্তায়-রাস্তায় মিছিল-বিক্ষোভ। অবশেষে একদিনের জন্য শহরে বন্ধও হয়ে গেল। সেটা আবার ইন্টারন্যাশনাল নিউজ হয়ে গেল।

এবার আর শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক বাজারে সরাসরি পৌঁছে গেল ছবিটা।

তেওয়ারি এতদিন খেলছিল টাকায়। এবার ডলারে খেলতে লাগল। রাজ্যের ডিস্ট্রিবিউটাররা বুক ঠুকে দাবি করল, এ ছবি তারা একশো সপ্তাহ চালাবে।

অরিন্দম আর তেওয়ারি এখন কিন্তু মরিয়া। এ যেন অদৃশ্য চালকের হাতে গাড়ি চলছে। তারা দুজন সওয়ারি—ড্রাইভারকে দেখা যাচ্ছে না।

এরকম একটা অস্থির সময়ে একদিন সকালে অরিন্দমের বাড়িতে ডাকে একটা চিঠি এল।

অরিন্দম চিঠিটা না পড়েই রেখে দিয়েছিল। পড়তে বাধ্য হল তেওয়ারির ফোনে।

ফোনের ওপাশ থেকে তেওয়ারির কাঁপা-কাঁপা গলাঃ 'অরিন্দমবাবু, আপনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও চিঠি পেয়েছেন? সাদা খাম, লাল বর্ডার?'

অরিন্দম উঠে গিয়ে সাদা খামটা হাতে তুলল 'হ্যাঁ, পেয়েছি। কেন?'

তেওয়ারি একইভাবে বলে, 'কারণ, আমিও একটা পেয়েছি।'

অরিন্দম খামের ভেতর থেকে চিঠিটা বের করে বলে, 'এ তো বাংলায় লেখা!'

ওপাশ থেকে তেওয়ারি বলে, 'আমারটা ইংরেজিতে। আগে পড়ুন, তারপর কথা হবে।'

অরিন্দম চিঠিটা পড়তে থাকেঃ

শ্রদ্ধেয় অরিন্দমবাবু,

আপনি আমাদের চিনবেন না। অবশ্য চেনার কথাও না। আমাদের কেউ চেনে না। আমাদের কেউ মনেও রাখে না। কারণ, আমরা নিঃশব্দে কাজ করি। আমরা সাইলেন্ট ওয়ার্কার্স। লোকে আমাদের কাজ দ্যাখে—আমাদের কেউ দেখতেও চায় না। অরিন্দমবাবু, আপনার মতো আমরাও জানি বালজাকের তত্ত্ব: 'প্রত্যেক সফল কাজের পিছনে কোনও না কোনও পাপ লুকিয়ে থাকে—বা প্রত্যেক সফল কাজের পেছনেই লুকিয়ে থাকে অপরাধের ভিত-পাথর। এখনও বুঝতে পারছেন না, আমরা কারা?

আমরা হলাম তারা—যাদের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঠকানো হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যাদের সভ্যতার নামে বলি দেওয়া হয়েছে—কখনও স্বদেশের নামে—কখনও নীতি বা আদর্শের নামে—কখনও স্বপ্নের নামে। আমাদের শুধু নিঃশেষ করা হয়েছে। তা হোক—কারণ, আমরা কেউ বাঁচতে চাই না। আমাদের কোনও লক্ষ্য ছিল না। আমাদের কোনও পথ ছিল না। আমাদের কোনও নায়ক ছিল না।

আমাদের সংখ্যা কিন্তু অনেক—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হিসেব করে দেখুন। সফল কাজের সংখ্যা যত, আমাদের সংখ্যাও তত। আমরা সভ্যতার সঙ্গে মিশে থাকি, কিন্তু মিশে যাই না। সফলতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকি, কিন্তু সফল হই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদেরই হাড়ের ওপর গড়ে ওঠা স্মৃতিসৌধ দেখে মানুষ মুগ্দ হয়, কিন্তু আমাদের স্মৃতিচারণ করে না।

আপনাদের সফল এবং সভ্য সমাজের কাজের স্রোতের পাশাপাশি আমরা একটা সমান্তরাল স্রোত। আমরা তো বলব আপনাদের থেকে আমাদের সংখ্যা অনেক বেশি। আমরা যুগ-যুগ ধরে নিজেদের একটু-একটু করে সংগঠিত করেছি। আজ আমরা সংগঠিত সমান্তরাল একটা শক্তি। আমাদের আর ব্যবহার করা যাবে না—আমরা ব্যবহৃত হতে না চাইলে। এবারে বুঝেছেন, আমরা কারা?

আমরা সেই সফল কাজের পেছনে থাকা অপরাধের ভিত-পাথরেরা। আমরা কতটা অরগানাইজ্‌ড আপনি নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন? দ্বিতীয় এবং স্তীয় আত্মহত্যা মানে দুটো ফ্রি গিফ্ট আপনাদের কিন্তু আমরা দিয়ে দিয়েছি। চতুর্থটা ফ্রি-তে হবে না।

আমরা, পাথরেরা, এবার সফল কাজের মানুষদের সঙ্গে ডিল করব—মানে আদান-প্রদান করব। আমাদের আর এমনি ব্যবহার করা যাবে না। এবার থেকে প্রত্যেক পাথরের জন্যে পাঁচ লাখ টাকা দিতে হবে। আপনি বলবেন, এ-টাকা দিয়ে আমরা কী করব? আমরা তো বাঁচতেই চাই না! আসলে এ-টাকায় আমরা ভিত-পাথরের সংখ্যা কমাব। আমরা চাইব, কোনও মানুষ যেন বাঁচতে না চেয়ে ভিত-পাথরে পরিণত না হয়। কোনও সফল কাজের পেছনে যেন কোনও পাপ লুকিয়ে না থাকে। জেনে রাখুন, চতুর্থ পাথরটা পড়বে পঞ্চাশতম সপ্তাহে। কোথায় টাকা পাঠাতে হবে, পরে জানিয়ে দেব।

—ইতি

পাথরেরা

অরিন্দমের হাত থেকে চিঠিটা খসে পড়ে যায়।

ফোনটা বেজে ওঠে—ও বুঝতে পারে এটা তেওয়ারির ফোন।

ফোনটা বেজে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির কাঁটাগুলো নির্বিকারভাবে চলতে-চলতে সব লক্ষ করছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~